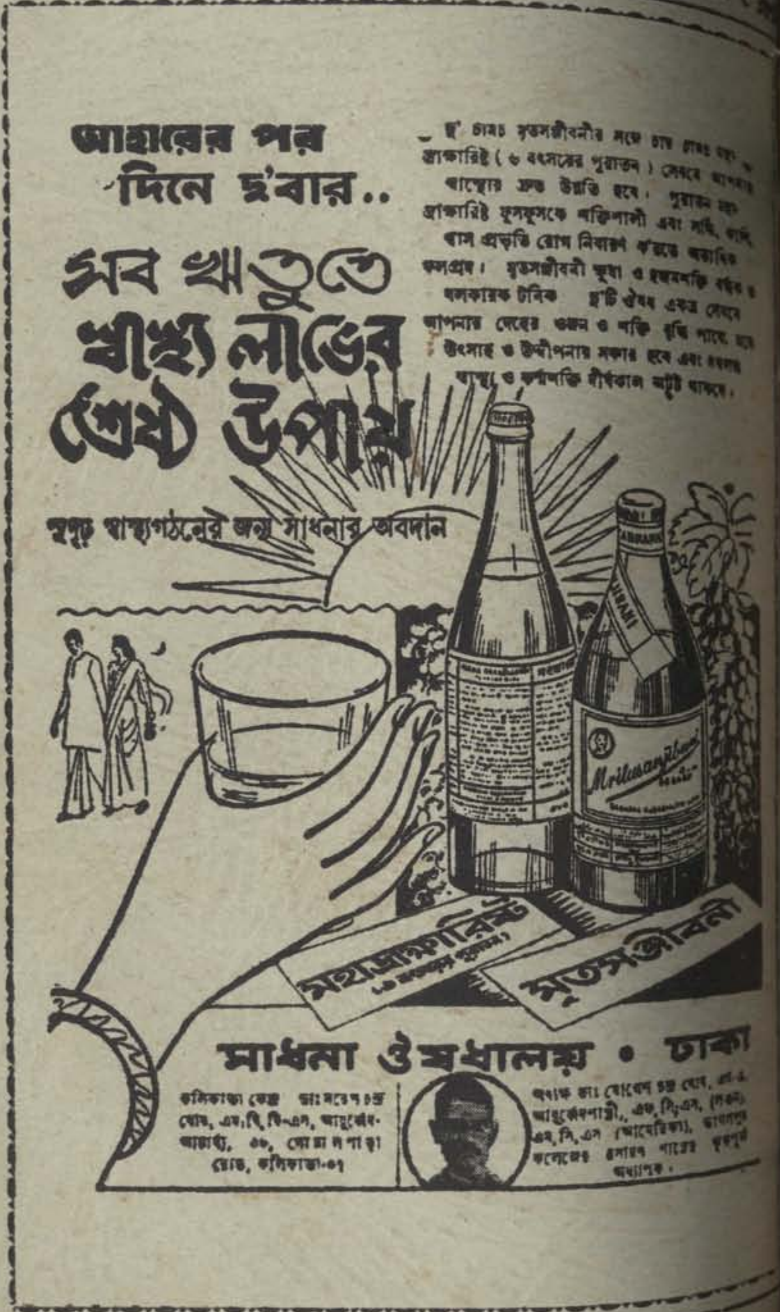

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

দাম : এক টাকা


পরিচয়
১৩৬৯



সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

...ত্তা গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



গল্পগুজব

শিল্পী: বিমল কর

আর্য ও অনার্য

নৃপেন গোস্বামী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রাত্য

ভারতীয় জনশ্রুতি অনুসারে অনার্য গোষ্ঠীও ব্রাত্য-রূপে বিবেচিত হয়েছে। শুধুমাত্র অবৈদিক আর্যরাই ব্রাত্য একথা বলা অযৌক্তিক।

বৈখানস-ধর্ম-প্রশ্ন অনুসারে :

(ক) উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের নারীর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় অনুলোম-বর্ণ ;

(খ) নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারী থেকে সৃষ্ট হয় প্রতিলোম-বর্ণ ;

(গ) প্রতিলোম বর্ণের পুরুষ ও নারীর সঙ্গমের ফলে উদ্ভূত হয় ব্রাত্য বর্গ। [৩।১১।২]

এই কল্পিত উৎপত্তি-বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন মনুর বচন। তিনি বলেছেন :

দ্বিজগণের সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তান যদি গায়ত্রী-বিহীন হয়, তাহলে সেই হচ্ছে ব্রাত্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্য ও বৈশ্যার সন্তান সদাচার-ভ্রষ্ট হলে ব্রাত্য হয়। [১০।২০]

মনুর আর একটি বচন অনুসারে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হতে উৎপন্ন হয়েছে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি (লিচ্ছিবি), খস, দ্রাবিড় প্রভৃতি। এগুলি যে কৌমের নাম এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। [১০।২২]

মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থে মল্ল একটি গণ বা ট্রাইব-রূপে বর্ণিত হয়েছে। [p. 231, I. 4. 5. (35)]

মল্লক ও লিচ্ছিবিক এই দুটি নামকে কৌটিল্য সঙ্ঘের তালিকা-ভুক্ত করেছেন। [অর্থশাস্ত্র ১১।১]

এস্থলে অনার্য কৌমও ব্রাত্য-রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে।

অবৈদিক গোষ্ঠীকে ব্রাত্যবর্গ হিসেবে বিচার কিংবা ক্ষত্রিয়বর্গে সংস্থাপন বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত, যার সঙ্গে আর্যীকরণকে সংযুক্ত করা চলে। যে কোনো অবৈদিক অথবা আর্যেতর গোষ্ঠীকে বর্ণপরিকল্পনায় সন্নিবেশের অর্থ হচ্ছে আর্যমূলকতা প্রতিপাদন। যারা যজ্ঞীয় আচার অনুসরণ করে না তাদের উৎপত্তিও আর্যমূলক এবং তারাও কোনো না কোনো প্রকারে আর্যসমাজের অঙ্গীভূত এই ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি অহেতুক নয়, এর প্রেরণা এসেছে আর্যীকরণের প্রয়োজন থেকে।

শঙ্কর-বর্ণের উপন্যাস

বর্ণ-শঙ্করের কিংবদন্তীর মূলে অন্তত আংশিক পরিমাণে রয়েছে আর্যীকরণের সামাজিক কৌশল। অনুলোম-রীতিতে পূর্বকালে তিন দ্বিজ-বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত, সুতরাং সঙ্কর ঘটত সামাজিক স্বীকৃতির ভিতর দিয়েই। কিন্তু সঙ্করের ফলে নিত্য নূতন উপবর্ণ গজাত এই স্মার্ত প্রকল্পটি ভিত্তিহীন। সঙ্কর-বর্ণের তালিকায় অনুপ্রবিষ্ট কিছু কিছু নাম যে কৌমনাম তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়।

ব্রাত্য কৌমগুলিকে সঙ্করবর্ণ হিসেবে বিবেচনার মধ্যে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নেই, কিন্তু এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বিবিধ বৃত্তিমূলক গোষ্ঠী কিংবা কৌমীয় গোষ্ঠী অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপবর্ণ-রূপে কল্পিত হয়েছে। সঙ্করের বিবরণগুলিতে কিছু কিছু মিল আছে, আবার অমিলও রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে চারি বর্ণের ছকের মধ্যে সর্বপ্রকার জন-গোষ্ঠীর সন্নিবেশ দ্বারা কৃত্রিম সামাজিক ঐক্য প্রতিপাদন।

কিছু কিছু নমুনা বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে যে উপবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনীগুলি অলীক কল্পনা-প্রসূত।

নিষাদ ও কৈবর্ত অনার্য কৌমরূপে প্রতিভাত হয়, অথচ মনুর বিবরণে সঙ্কর-জাত বর্ণ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। [মনু ১০।৮, ৩৪]

নিষাদ খাদ্য সংগ্রহের পর্যায় অতিক্রম করে নি। তার বৃত্তি পশু বা মৎস্য শিকার। দাশ-কৈবর্ত নৌকর্মজীবী, অর্থাৎ, মাঝি।

মনু বলছেন যে নিষাদ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার অনুলোম মিলন-জাত সন্তান। প্রায় একথাই বলছেন বৈখানস। তাঁর বিবেচনায় ব্রাহ্মণ জারের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিষাদের উৎপত্তি হয়েছে। [মনু ১০।৮ ; ধর্ম প্রশ্ন ৩।১৩।২]

বাজসনেয়ি-সংহিতায় দাশ, কৈবর্ত ও কিরাত একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে এবং এদের কৌমীয় লক্ষণ সুপরিস্ফুট। [৩০।১৬]

বৈখানসের বিচারে আয়োগব হচ্ছে তন্তুবায়, তার জন্ম হয়েছে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া থেকে। [ধর্মপ্রশ্ন ৩।১৪।১]

মনু-স্মৃতিতে আয়োগব হচ্ছে ছুতার এবং শূদ্র ও বৈশ্যার সন্তান। [১০।১২]

এক্ষেত্রে দুটি উৎপত্তি-বিবরণ পরস্পর-বিরোধী। পৌল্কস বা পুল্কস প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবরণগুলিতে অনুরূপ অনৈক্য লক্ষিত হয়। পুল্কস বোধ হয় কৌমী লক্ষণ-যুক্ত বীভৎস-বৃত্তিজীবী একটি কৌম, কিন্তু কল্পিত হয়েছে শূদ্র-ক্ষত্রিয়ার কিংবা বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ার কিংবা নিষাদ-শূদ্রার মিলন-জাত সন্তান-রূপে। [বা সং ৩০।১৭ ; গৌতম, ৪র্থ অ ; বিষ্ণুস্মৃতি ১৬।৫ ; মনু ১০।১৮]

বর্ণ-শঙ্করের কাহিনীর সবটুকুই হয়তো অবিশ্বাস্য নয়। সাধারণ সামাজিক ঘটনা হিসেবে যৌন সংমিশ্রণ সর্বকালীন সত্য আলেখ্য। কিন্তু বিভিন্ন উপবর্ণের উৎপত্তির একমাত্র কারণরূপে সঙ্কর কল্পিত হতে পারে না। উৎপত্তি-মূলক বিবরণগুলি যে অনেকাংশে পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এরূপ ধারণাই হয়, যখন আমরা সম্পূর্ণ বর্ণের ছকটিকে বিশ্লেষণ করতে বসি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় প্রণিধান-যোগ্য। প্রথমত, স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণগুলি [illegible] বৃত্তি-মূলক কিংবা কৌমীয় গোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত বর্ণের সমকালীন অস্তিত্ব সন্দেহ করা যায় না এবং সেইজন্যই এক বর্ণ থেকে অপরবর্ণের উৎপত্তি সম্ভাব্য ঘটনা হতে পারে না। তৃতীয়ত, আর্যীকরণের একটি পর্যায়ে সমগ্র সমাজের একটা সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিপাদন আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কোনো যথার্থ ঐক্যসূত্র সম্মুখে ছিল না। বিভিন্ন বৃত্তির উপর নির্ভরশীল অসংখ্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি ছিল গিল্ড্-এর (guild-এর) আকার-প্রাপ্ত। এগুলির পাশাপাশি বিরাজ করছিল কৌমীয় গোষ্ঠী-সমূহ এবং তাদের সংখ্যাও কম নয়। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে একটি সূত্রে গ্রথিত করার উপযোগী উপকরণ সমাজ-জীবনে ছিল না। কৃত্রিম ও কাল্পনিক ঐক্য-সূত্রের সন্ধান মিলল গোত্র ও বর্ণ-সংক্রান্ত অলীক বিশ্বাস কিংবা Social myth-এর মধ্যে। গোত্র-পরিচয়ের মূল কথা হচ্ছে আটজন বৈদিক ঋষির সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে বিশ্বাস। মিশ্র বর্ণ-[illegible] পরিকল্পনায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে সকলেরই উৎপত্তি-রহস্য নিহিত [illegible] চারিবর্ণের অনুলোম বা প্রতিলোম মিশ্রণে। এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি না থাক,

কার্যকরিতা (function) আছে। এর সহায়তায় ঐক্যের ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি নির্মিত হয়েছে। ব্রাত্য বা অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্য-মূলকতা প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ্য কৌশল সহজেই অনুমেয় এবং এর ফলে সামাজিক অখণ্ডতা-বোধ ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে, যার অন্তত একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই দার্শনিক শঙ্করাচার্য কর্তৃক ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

আর্যীকরণ-প্রক্রিয়ায় সামাজিক ক্ষেত্রে দুইটি ব্যাপার প্রাধান্য পেয়েছে—গোত্রে অন্তর্ভুক্তি এবং সঙ্করজ বর্ণ-রূপে পরিচয় দান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভিল্ল, হড্ডি, ডম—অর্থাৎ, আমাদের পরিচিত ভিল, হাড়ি ও ডোম—কল্পিত হয়েছে মিশ্র বর্ণ-রূপে। হাড়ি ও ডোমের কাশ্যপ গোত্রও জুটেছে। এধরনের নিদর্শনে স্ফুট হচ্ছে সমাজের নিম্নতম স্তরেও আর্যীকরণের প্রসার। [ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৭, ১০৫]

কৃত্রিম গোত্র ও বংশ-পরিচয়

বর্ণ-সঙ্করকে ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতির কল্পিত উপন্যাস-রূপে বর্ণনা করেছেন লুই রেনো। বহুস্থলে গোত্র-পরিচয়ও কৃত্রিম বন্ধন-সূত্র-রূপে প্রতীত হয়। যে সকল গোষ্ঠীর আর্যত্ব প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাদের ভিতরেও প্রবেশ করেছে বৈদিক গোত্রের জনশ্রুতি। একদিকে উপবর্ণের (sub-caste-এর) ক্রমবর্ধমান তালিকা, আর এক দিকে গোত্র-পরিচিতির ক্রমিক প্রসার—এই দুটি ব্যাপারের মধ্য দিয়েই সমর্থিত হয় আর্যীকরণের প্রকল্প। কিছু কিছু উপবর্ণ স্পষ্টতই কৌমের চেহারা-যুক্ত। বেশ বোঝা যায় হিন্দু সমাজে এদের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত হয়েছে চারি বর্ণের সংগঠনে বিশেষ একটা স্থান এদের জন্য নিরূপণের দ্বারা। অর্থাৎ, হিন্দু সমাজে নবাগতেরা কোনো বৈদিক গোত্রের ঐতিহ্য গ্রহণ করেছে এবং উপবর্ণ-রূপে গণ্য হয়েছে। [pp. 49, 66, *The civilization in ancient India,* Louis Renou, 1954]

একটি কৃত্রিম বিশ্বাসের ফলে নাম্বূদ্রী পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ-তালিকা-ভুক্ত হয়েছে, এদের সঙ্গে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের আচার-গত মিল হয়তো সামান্য। অন্ধ্রের তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণরা পরিচয় দিচ্ছেন সামবেদী-রূপে, আবার, গৌতম, ভারদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের ঐতিহ্যেও বিশ্বাসী। সারা ভারত জুড়ে একই গোত্র বিদ্যমান, অথচ সামাজিক রীতিনীতিতে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের প্রচুর বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে।

গোত্র-পরিচয়ের অর্থ যদি হয় একরক্তের ধারা, তাহলে বহুক্ষেত্রে কৃত্রিম গোত্রের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করবার সূত্র কোথায়? Clan-Kinship বা গোত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন বৈদিক আমলে আংশিকভাবে সত্য হলেও পরবর্তীকালে ঋষির গোত্রের দ্বারা পরিচয়-রীতি সর্বত্র সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই গোত্রের ক্ল্যান-তাৎপর্যকে অবিশ্বাস করা হয়েছে। ললিতবিস্তর-এর একস্থলে শুদ্ধোদন বলছেন :

ন হি কুমারঃ কুলার্থিকঃ ন গোত্রার্থিকঃ গুণার্থিক এব কুমারঃ। [অ ১২, পৃঃ ১৩৯]

এক্ষেত্রে কুল ও গোত্রের মধ্যে তফাৎ করা হচ্ছে। কুল রক্তের সম্পর্ক বোঝায়, কিন্তু গোত্রের অর্থ অন্যপ্রকার। গোত্র বোধ হয় শুধু বৈদিক ঐতিহ্যের ক্ষীণ সূত্রটি রক্ষা করে।

বোধায়ন বলছেন যে সগোত্রা রমণীর সঙ্গ করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত পালনীয়, এরূপ সহবাসের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তার গোত্র হচ্ছে কাশ্যপ। [প্রবর ...১০।৫৪]

সংস্কার-ময়ূখ-এর মতে গোত্র বিস্মৃত হলে কাশ্যপ গোত্রের দ্বারা পরিচয় দেওয়া। [p. 95, vol. I]

অভিনব-মাধবাচার্য সগোত্রা-জাত সন্তানকে কাশ্যপ বা ভারদ্বাজ গোত্রে স্থান দিয়েছেন। [পৃঃ ৩৫২, গোত্র-প্রবর-নিবন্ধ-কদম্বলম্]

গোত্র-বিহীনদের উপরে কাশ্যপ গোত্র আরোপের রীতিটি চলে এসেছে ...কার কাল পর্যন্ত।

রিজলী-বর্ণিত বাংলার নব-শায়ক বর্ণগুলি,—মালী, তাম্‌লী, তাঁতী, কামার, কুমার, নাপিত, গোয়ালা, কাঁসারী, শাঁখারী—কাশ্যপ বা আলম্যান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আলম্যান হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের আলম্বায়ন।

ডোম, মৎস্যজীবী বাগ্‌দী প্রভৃতির মধ্যেও এই দুইটি গোত্র প্রচলিত। হাটনের (J. H. Hutton-এর) মতে ডোম হচ্ছে একটি কৌম। বাগদীও সম্ভবত একটি কৌম।

এ-জাতীয় নিদর্শন গোত্র-পরিচয়ের অলীকতাই প্রতিপাদন করে। গোত্রের অর্থ একেবারে প্রথমে ছিল গোশালা, তারপর রক্ত-সম্পর্কিত ক্ল্যানকে নির্দেশ করত। এর সর্বশেষ তাৎপর্য হচ্ছে আর্য ঐতিহ্যের স্মারক-সূত্র, যদিও কোনো স্থলে কুলের অর্থে গোত্র-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাম্রলেখ প্রভৃতিতে।

কৃত্রিম গোত্রের ব্যাখ্যা মিলছে একমাত্র আর্যীকরণের পটভূমিকে বিবেচনা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋষি-গোত্র ছাড়াও অন্য নামের গোত্রের দ্বারা আর্যীকরণের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছে। কতকগুলি গোত্রের হদিশ মেলে না বৌধায়ন-প্রদত্ত তালিকায় কিংবা পি চেন্তসাল রাও-এর প্রদত্ত তালিকায়। যথা,

উড়িষ্যার কৃষিজীবী লৌকিক ব্রাহ্মণদের মস্তানী, পনিয়ারী গোত্র, উড়িষ্যার করণদের নাগ গোত্র; বাংলাদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বাজিশ্লেথ গোত্র, সেন কায়স্থদের বাসুকি গোত্র, গুহ-উপাধি-ধারী কায়স্থের কল্কী গোত্র, ঘোষ কায়স্থের সৌকালিন গোত্র, নাথযোগীর শিব গোত্র ইত্যাদি।

এই গোত্রগুলির আঞ্চলিক উদ্ভব ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বকালিন পিতৃগণের সঙ্গে সৌকালিনের সম্বন্ধ থাকতে পারে।

কৃত্রিম বংশ-পরিচয়ের নমুনা লক্ষ্য করছি বৈদিক সাহিত্যেই।

শুনঃশেপের প্রসিদ্ধ কাহিনীর একস্থলে বর্ণিত হয়েছে যে বিশ্বামিত্রের একশত ছেলের মধ্যে পঞ্চাশজন তাঁর অবাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদেরই বংশধর অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি যে অনার্য কৌম এ বিষয়ে সংশয় নেই। একজন আর্য আদি পিতা থেকে উৎপত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্য ও অনার্যের ভেদ-গণ্ডীর অপসারণ। [ঐ ব্রা ৭।৩।৬]

আর্য অনার্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হওয়ায় অনার্য কৌমগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কষ্টকর। আবার একথাও সত্য যে আর্যীকরণের ব্যাপারটা কোনো এক যুগে সমাপ্ত হয়ে যায় নি, বরঞ্চ যুগ যুগ ধরে চলেছে। এককালে যাঁরা অনার্য ছিলেন তাঁরা আর্যসমাজে গৃহীত হয়ে পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছেন। বর্ণ ও গোত্রের তালিকায় বহু কৌমের নাম প্রবেশ করেছে এবং এগুলির অনার্য ঐতিহ্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। বংশ-বিবরণে আদি পিতার স্থানটিতে কোনো আর্য ঋষি বা রাজা বা দেবতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং কৌমের উপর আরোপিত হয়েছে কৃত্রিম বর্ণ ও গোত্র-পরিচয়।

কৃত্রিম বংশ-পরিচয়ের কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হতে পারে। যথা:

বায়ুপুরাণের মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই কয়টি কৌমের আদি পিতা হচ্ছেন ঋগ্বেদীয় ঋষি দীর্ঘতমা। [৯৯।৮৫-৮৭]

পরমার রাজপুতেরা বিশ্বাস করে যে তারা অগ্নি-কুল-সম্ভূত। চন্দেল

রাজপুতেরা চন্দ্রবংশী। মিবার, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজপুতেরা সূর্যবংশী। মিবারের রাণাগণ হচ্ছেন লব-বংশীয় এবং মরবারের রাজপুতেরা কুশ-বংশীয়। নাগপুরের রাজপুতেরা রঘুবংশীয়। যোধপুরের রাঠোরেরা সূর্যবংশীয়। কদম্ব রাজাগণের গোত্র মানব্য। পল্লবগণের গোত্র ভরদ্বাজ। চালুক্যেরা সোম (চন্দ্র) থেকে বংশধারা গণনা করেছেন। বাকাটকদের গোত্র বিষ্ণু বৃদ্ধ।

[B. O. R. Ehrenfels, James Tod, S. K. Aiyangar-এর এবং বিভিন্ন তাম্রশাসনের বিবরণ থেকে উক্ত নজীরগুলি গৃহীত হয়েছে।]

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে পৌরাণিক জনশ্রুতিতে আর্য রাজবংশ হচ্ছে প্রধানত দুইটি—সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ—আরও একধাপ নীচে নামলে মনুর ধারা এবং ঐলের ধারা। পার্জিটার এই দুই ধারার সঙ্গে আরও একটি ধারাকে জুড়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রাজবংশগুলিকে কৃত্রিমভাবে এই দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ঈদৃশ সম্পর্ক স্থাপনকে বলা চলে Social myth বা সামাজিক উপন্যাস। সার হেনরী মেইনের বিখ্যাত গ্রন্থে ক্ল্যানের একরক্ত-মূলক বিশ্বাসেও অনুরূপ মিথ্যা কল্পনার প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে [pp 76-77, *Ancient law*]

আরও একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। যে কৌম-নামগুলি বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয় সেগুলি পৌরাণিক বংশধারায় ক্রমিক রীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। পুরাণের কালক্রম অনুসারে ঐলের ধারায় এসেছেন পূরু ও যদু, পূরুর ধারায় এসেছেন ভরত। ঋগ্বেদীয় বর্ণনার ধরনে মনে হয় যে ভরত, পূরু ও যদু কৌম-নাম এবং এই কৌমগুলির সমসাময়িক অস্তিত্ব সম্ভবত সন্দেহের বিষয় হতে পারে না। কৌমের নাম কি করে রাজার নাম হতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন কৌম-নামকে একটিমাত্র ধারায় সন্নিবেশের সূত্র কোথায়? বৈদিক কৌমতন্ত্রীয় প্রথায় একজন আদিপিতা বা কৌম-প্রতিষ্ঠাতার নামই হচ্ছে কৌমের নাম, আবার কৌম-নাম আরোপিত হয় ব্যক্তির উপর। যদু-কৌমের আদিপিতা একজন রাজা, তিনিও যদু, আবার তাঁর ধারায় যে কোনো রাজাও যদু-নামের উত্তরাধিকারী, তাঁর কৌমের যে কোনো লোক যদু-নামে পরিচিত হতে থাকবেন। কৌমীয় সংগঠনেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন লাভ করেছে, কাজেই পৌরাণিক বিবরণের সত্যতা আংশিকভাবে স্বীকার্য। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌমের সংমিশ্রণ ঘটেছে এরূপ অনুমান করেছেন এন. কে. দত্ত, রঙ্গাচার্য প্রভৃতি। যদু, পূরু, ভরত, কুরু, প্রভৃতি কৌমের একীকরণ

একটি দীর্ঘকালীন ব্যাপার, এর ফলে পূরুর ধারায় ভরতের, ভরতের ধারায় কুরুর সংস্থাপন কৃত্রিম কল্পনার সাহায্যে রাজবংশীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এস্থলে পৌর্বাপর্যের খসড়াটি অনেকাংশেই অনির্ভরযোগ্য। আবার আর্যীকরণের আমলে নিতান্ত কৃত্রিমভাবেই বিভিন্ন রাজবংশ পৌরাণিক বংশধারায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আর্যীকরণের সহযোগী শূদ্রীকরণ

আর্যীকরণের উদ্দেশ্যে অনার্য গোষ্ঠীগুলির আর্যমূলকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা শুরু হয়েছে বৈদিক আমল থেকেই। এর ফলে আর্য ও অনার্যের শোণিতগত পার্থক্য ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধরনের গোষ্ঠীগত চেতনা দেখা দিয়েছে। পূর্বেকার কৌমীয় চেতনার মধ্যে ছিল একরক্তের বোধ। বিভিন্ন আর্যকৌমের সংমিশ্রণ যে সময়ে ঘটেছে, তখন আর্যসমাজে অনার্যগোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্তিও চলছে, এর দরুণ সমাজের পরিধি স্ফীত হয়েছে অপরিমিতভাবে এবং সেখানে ফুটে উঠেছে নূতন একটি দৃশ্য, যার সঙ্গে কৌমী দৃষ্টিকোণের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। বৃত্তি অনুসারে যে সকল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, সেগুলিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গিল্ড্-এর লক্ষণ স্ফুট হয়েছে, সেই সঙ্গে জন্মগত বর্ণ বা caste-এর একরক্ত-মূলক চেতনা বিকশিত হয়েছে প্রায় কৌমীয় রীতিতে। ট্রাইবের সঙ্গে তুলনীয় জাত্-এর শোণিত-সচেতন সঙ্কীর্ণতা। আর্যীকরণের ফলে সামাজিক প্রসারণ সহজেই বুদ্ধিগম্য, কিন্তু যুগপৎভাবে জাত্-এর দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব বিস্ময়কর। দুটি ঘটনাই সমাজ-সংগঠনের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। জাত্-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রীকরণের দিকে একটা ক্রমবর্ধমান প্রবৃত্তিও ভারতীয় সমাজের রূপায়ণে সহায়তা করেছে।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক সংগঠনে শূদ্রীকরণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন জাত্ বা গোষ্ঠীকে সাধারণভাবে দুই থাকে সাজাবার আগ্রহ এখানে প্রবল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাইরে কোনো বর্ণ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবত সরলীকরণের প্রবৃত্তি-জাত। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য, করণ-কায়স্থ প্রভৃতি উপবর্ণের উপর শূদ্রত্ব আরোপের মূলে এই প্রবৃত্তি হয়তো ছিল। সঙ্কর-বর্ণ-রূপে যে সকল বৃত্তি-গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা কল্পিত হয়েছে, নৃবিজ্ঞানের ভাষায় তারা হচ্ছে এক একটি closed status group বা বদ্ধ গোষ্ঠীমাত্র।

এদের ভিতরে আবার উত্তম সঙ্কর, মধ্য সঙ্কর ও অন্ত্যজ এই তিন পর্যায় স্থাপিত হয়েছে। অন্য দিক দিয়ে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র-রূপে মর্যাদা-বিভাগ সমর্থন পেয়েছে। সমস্ত সমাজের অঙ্গনটি যেন মর্যাদার প্রতিযোগিতার দৃশ্য। ব্রাহ্মণের দাবী—"পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই, ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই";— কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক না দেখাতে পারলে ব্রাত্য ঐতিহ্য ধরা পড়ে। করণ-অম্বষ্ঠ-নাপিত-মোদকেরা রজক-স্বর্ণকারকে স্বীয় পংক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, সর্বনিম্ন পংক্তিতে বিরাজ করছেন মলেগ্রহি বা মেথর, চর্মকার প্রভৃতি। ঈদৃশ সামাজিক পংক্তিবোধের মাঝখানে একটা জিনিস আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তা হচ্ছে শূদ্রের গোত্র-পরিচয়। রঘুনন্দন বলেছেন উদ্বাহতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে :

দ্বিজাতিগ্রহণং সগোত্রা বর্জনে
শূদ্রব্যাবৃত্ত্যর্থম্।

অর্থাৎ, তিন দ্বিজ বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু শূদ্রের বেলায় এই নিয়ম বর্তায় না। এস্থলে পরোক্ষভাবে শূদ্রবর্ণের সগোত্রা-বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে এবং তার গোত্র-পরিচয় না থাকলে উক্তিটি হয় নিরর্থক।

আর্যীকরণের দৌলতে গোত্র-বিহীন কোনো জাত্ আমাদের চোখে পড়ে না। [ব্রহ্ম বৈবর্ত, ব্রহ্ম খণ্ড ১০।১৮; পৃ ৫৭২, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, ১৮৮০; *The history of Bengal*, Vol. I, XV]

সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে অনার্য প্রভাব

আর্য ও অনার্যের পারস্পরিক প্র-ভাবের ফলে গড়ে উঠেছে হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু নামটি ইরাণীদের দেওয়া। বেদোক্ত সিন্ধু মিহির-যস্তে হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে, আবেস্তার অন্যতম গবেষক মার্টিন হগ একথা বলেন। হিন্দু নামের আদি অর্থ সিন্ধুতীরবাসী, পরবর্তী তাৎপর্য ভারতীয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে আমরা বুঝি একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কোনো নৃবংশ বুঝি না। আর্য ও দ্রাবিড়ের মতোই হিন্দু-শব্দ কোনো নৃবংশের দ্যোতক নয়।

আর্যপ্রভাবমুক্ত অনার্য সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে সিন্ধু উপত্যকার নজীর উপস্থাপিত হতে পারে। ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতিতে সামান্য অনার্য প্রভাব থাকাই সম্ভব। প্রথমটিতে শহরে বাস, পাকা দালানে বাস, লিপিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার

উপযোগী বিষয়গুলি বর্তমান ; কিন্তু শেষোক্ত সংস্কৃতিতে গ্রামীন জীবন, কাঠের ঘরে বাস, নিরক্ষরতা আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের আরও কিছু নমুনা উল্লেখযোগ্য। যথা :

(ক) সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শীলমোহরগুলিতে ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখা যায় না, কিন্তু ঋগ্বেদে অশ্বের প্রাধান্য রণতান্ত্রিকতার পরিচায়ক।

(খ) সিন্ধুতীরবাসীদের নিকটে উট ও বিড়াল অপরিচিত নয়, কিন্তু ঋগ্বেদে উল্লিখিত উষ্ট্র পণ্ডিতদের দ্বারা মহিষ-রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঋগ্বেদে, এমনকি বৈদিক সাহিত্যেই বিড়ালের বাচক শব্দ আছে কিনা সন্দেহ।

শুক্ল যজুর্বেদের বৃষদংশ উবট ও মহীধরের ভাষ্যে বিড়াল-রূপে গণ্য হয়েছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা সন্দেহের উদ্রেক করে। [বা সং ২৪।৩১]

ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে উট ও বিড়াল অজ্ঞাত।

উটের বাচক সংস্কৃত ক্রমেলক ও ইংরেজী ক্যামেল-এর মূলে রয়েছে হিব্রু গামাল (gamal) শব্দ।

(গ) সিন্ধু সভ্যতায় কার্পাসের প্রচলন এবং ঋগ্বেদে কার্পাস-বাচক শব্দের অনুল্লেখ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কৌতূহল জাগ্রত করে। ঋগ্বেদীয় উর্ণা হচ্ছে পশম, এর অনুরূপ গ্রীক এরিয়ন (erion) পশমের অর্থই বোঝায়। পশমের বস্ত্র ঋগ্বেদীয় আর্যদের একমাত্র পোশাক এবং হিন্দো-ইউরোপীয় উত্তরাধিকার।

সংস্কৃত ভাষায় কার্পাস বোধ হয় উর্ণার চেয়ে অর্বাচীন শব্দ, যদিও এর অনুরূপ গ্রীক কর্পাসস, (Karpasas) আভিধানিকদের নজরে পড়েছে। এই শব্দ-গত মিলের অর্থ হতে পারে ভারতবর্ষ থেকে মধ্য প্রাচ্যের ভিতর দিয়ে কার্পাসের ইউরোপ-যাত্রা। এই কারণেই হয়তো ইংরেজী কটন-শব্দটিও আরবী-মূলক।

আর একটি অনুমানও সম্ভাবনার সীমা লঙ্ঘন করে না। আর্যসমাজে কার্পাসের প্রচলন অনার্য প্রভাবে হয়েছিল একথাই বলতে সাহসী হচ্ছি।

(ঘ) বৈদিক সমাজে তিল, কলাই ও গমের প্রচলনে হরপ্পার প্রভাব অনুমেয়, কেন না ঋগ্বেদে উল্লিখিত একমাত্র খাদ্যশস্য হচ্ছে যব।

ঋগ্বেদে চাউলের বাচক ব্রীহি-শব্দের অনুপস্থিতি যদি অমূলক না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে চাউলের প্রচলনেও অনার্যের হাত রয়েছে।

সুনীতিবাবু তিল, তণ্ডুল ও ব্রীহিকে অনার্য শব্দ-রূপেই গণ্য করেছেন। তাঁর মতে চাউল হচ্ছে অষ্ট্রিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু চাউলের ব্যাপারটা বোধ হয় কিছু গোলমেলে।

তারাপোরওয়ালা জানিয়েছেন যে চাউল-বোধক তামিল শব্দ হচ্ছে অরিসা। এই শব্দটি সেমিটিক অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গ্রীসদেশে পদার্পণ করে। এর গ্রীক রূপ ওরুজা, (Oruza), ইংরেজী রাইস্-এর আদি জনক।

আর একটি সমস্যা সৃষ্টি করছে ওরাওঁ-ইংরেজী অভিধানে প্রাপ্ত তিনটি শব্দ। এই তিনটির সঙ্গেই চাউলের সম্পর্ক প্রতিভাত হচ্ছে। যথা :

বিহিনী—বীজশস্য
বিহিরী—সংগ্রহ
বীরা—ধানের অঙ্কুর।

ওরাওঁরা আদি-অষ্ট্রেলীয় হলেও কথা বলে দ্রাবিড় ভাষায়।

উক্ত শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ব্রীহির আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্য প্রকৃত কিনা ভাষাবিদরা বিচার করবেন। চাউলের প্রচলনে দ্রাবিড় প্রভাব থাকতে পারে।

ঋগ্বেদে অনার্য শব্দের প্রবেশ সত্য হলে অনার্য প্রভাবের প্রাচীনতা সূচিত হয়। কিছু কিছু ঋগ্বেদীয় শব্দের দ্রাবিড় মূলকতা আন্দাজ করেছেন সুনীতিবাবু। যথা, কপি, কর্মার, কাল, পুষ্কর (পদ্মফুল), পুষ্প, বীজ, কিতব (অক্ষক্রীড়ক) ইত্যাদি। আবার, প্শিলুস্কির মত উদ্ধৃত করে লাঙ্গল-শব্দের অষ্ট্রিক উৎপত্তি প্রতিপাদন করেছেন। অথর্ববেদীয় কম্বল-শব্দের অর্থ পশমের বস্ত্র। এটিও নাকি অষ্ট্রিক-মূলক। [পৃ ৭৬, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ; p. 42, *The origin and development of the Bengali language*, part I, 1926 ; অথর্ব ১৪।২।৬৬]

মাছের ব্যাপারটিতে ইদানীং সংশয় জেগেছে। কেউ কেউ বৈদিক আর্যদের মৎস্য ভক্ষণকে স্বীকার করছেন। হরপ্পায় খনিত Cemetary H-রূপে নির্দিষ্ট কবর-স্থানে ভৃঙ্গার-চিত্রে মাছ আবিষ্কৃত হয়েছে। মাছের অর্থেই মৎস্য-শব্দের প্রয়োগ ঋক্‌মন্ত্রে লক্ষিত হয়। উক্ত কবরখানাকে ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা যায় কিনা এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব হলে ঋগ্বেদীয় খাদ্য তালিকায় মাছের প্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমরা নূতনতর আলোকপাতের অপেক্ষায় আছি। [ঋ ১০।৬৮।৮]

এবারে পুষ্প ও পূজার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দুটি শব্দকে দ্রাবিড় মূলক

প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা অনেকদিন ধরে চলছে। ফুল-বাচক দ্রাবিড় পু-শব্দের সঙ্গে নাকি পূজার সম্বন্ধ রয়েছে। একথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে যজ্ঞীয় চর্যা (cult) ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হলেও পূজা-চর্যার প্রতিপাদক ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করা যায় না, অপরপক্ষে সিন্ধু সংস্কৃতিতে পূজা-চর্যার উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। পূজার আর্যত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত পুষ্প-যজন থেকে পূজা-শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পিত। কীথ বলেছেন যে, মূর্তি-পূজার বৈশিষ্ট্য-বর্জিত ধর্মীয় বিশ্বাসে আদি জার্মান, আদি ইরাণীয় ও বৈদিক আর্যদের মিল রয়েছে। ঋগ্বেদে দু জায়গায় শিশ্নদেব বা লিঙ্গপূজক, অর্থাৎ, মূর্তিপূজক নিন্দিত হয়েছেন। শুধু পূজন-শব্দটির প্রয়োগ একস্থলে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শাচি-পূজন। সায়ণ-ভাষ্য অনুযায়ী অর্থ টা হচ্ছে—ইন্দ্রের পূজন প্রখ্যাত। পূজনের সূত্র ধরে মূর্তি-পূজা প্রতিপাদন করা যায় না। কিন্তু যজন-ব্যাপারটি ইন্দো-ইউরোপীয় আমল পর্যন্ত প্রসারিত। বৈদিক আর্য, ইরাণীয় ঐর্য এবং গ্রীকরাও যজনাচারী ছিলেন। এ বিষয়ে ভাষা-গত নজীরও রক্ষিত হয়েছে। যথা :

বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে তুলনীয় ইরাণীয় যস্ন। যস্নের অর্থ যজ্ঞ বা যজ্ঞীয় প্রার্থনা। সংস্কৃত যজামি-পদের সদৃশ গ্রীক হজোমৈ, (hazomai) পদটি। [গ্রে এবং তারাপোরওয়ালার উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য ; শাচিপূজন—ঋ ৮।১৭।১২]

হিন্দু পূজায় কিছু কিছু যজ্ঞীয় আচারের অন্তর্ভুক্তিতে ধরা পড়ে সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী।

শিব-সম্বন্ধীয় চর্যায় অনার্য প্রভাব থাকা সম্ভব। যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়-রূপে খ্যাত হোম-মন্ত্রগুলিতে শিব-দেবতার কল্পনার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। এমনকি ভব, শর্ব, শিব, শংকর প্রভৃতি শিবের নামের উল্লেখ দেখছি। এই শিব ঠিক ঋগ্বেদীয় রুদ্র নন। এঁর সঙ্গে সিন্ধু-সংস্কৃতির অন্তর্গত শীলমোহরে অঙ্কিত শিব বা যোগী-মূর্তির সম্পর্ক থাকতে পারে। (শীলমোহরের মূর্তিকে শিব-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন মার্শাল, পিগট প্রভৃতি।) সিন্ধু উপত্যকার কিছু কিছু উপকরণে লিঙ্গ ও মাতৃকা-চর্যার প্রমাণ পেয়েছেন অনেকেই। ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজা বা মাতৃকা-চর্যার সমর্থক উক্তি মেলে না, যদিও মাতা পৃথিবী-কল্পনায় উর্বরতা-অনুষ্ঠানের আভাস পাই। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে উর্বরতা-সংক্রান্ত বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ চোখে না পড়ে পারে না এবং এই ব্যাপারে, বিশেষত অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় কার্যকলাপে অনার্য প্রভাব কেউ কেউ অনুমান করেছেন। যজ্ঞস্থলে যথার্থ মৈথুন

কিংবা মৈথুনাভিনয় উর্বরতা-অনুষ্ঠানের স্থূল রূপ মাত্র। মহাব্রত অনুষ্ঠানে পুংশ্চলূ বা বেশ্যার আমদানি এবং তার সঙ্গে মাগধের যৌন মিলন, গোসব যজ্ঞে মাতা-ভগ্নীর সঙ্গে গোজাতির অনুকরণে মৈথুনাভিনয় হচ্ছে উর্বরতা-চর্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে অনার্য প্রভাব আছে কিনা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয় এবং যৌন আচরণ-সমন্বিত চর্যামাত্রই অনার্য-প্রভাবিত একথা মনে করাও অশোভন। যজ্ঞ ও পূজায় স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে উর্বরতা-চর্যার সংস্পর্শ থাকবেই, কেননা উভয়েরই লক্ষ্য সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ। উভয়ের মধ্যে তফাৎ নিছক আকৃতিগত, প্রকৃতি-গত নয়। উভয়েই ম্যাজিকের লক্ষণযুক্ত, যদি প্রকৃত ম্যাজিক নয়।

লিঙ্গ পূজার অনার্যত্ব স্বীকার্য হলেও বৈদিক মানসে হল-কর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা-প্রবৃত্তি কেন দেখা দিয়েছে এই প্রশ্নের জবাব মেলে উর্বরতা-চর্যার মধ্যেই। একটি ঋক্‌মন্ত্রে পুংলিঙ্গকে খনিত্ররূপে উপস্থাপনা তাৎপর্যহীন নয়। [ঋ ১০।৮৫।৩৭ ; ১।১৭৯।৬]

লিঙ্গ পূজায় হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত সাদৃশ্য দেখে লিঙ্গ-সংক্রান্ত চর্যাকে আর্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করবার লোভ জাগে। সুরা-দেবতা ডাইওনিসাস-এর উৎসবে লিঙ্গমূর্তি ব্যবহার এবং হিন্দুদের লিঙ্গার্চনা পরস্পরের সজাতীয়। কিন্তু গ্রীকদের ক্ষেত্রে সেমিটিক প্রভাব অনুমানের অবকাশ রয়েছে, ঠিক যেমন লিঙ্গ-চর্যার ভারতীয় সংস্করণে হরপ্পার প্রভাব অনুমেয়। য়িহুদীদের দ্বারা অর্চিত বাল (Baal) দেবতার প্রস্তরে নির্মিত প্রতীক-মূর্তি শিবলিঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [pp. 111-113, *Sexual life in ancient Greeee*, Hans Licht, 1949 ; pp. 184-185, *New light on the most ancient East*, Gordon Childe.]

ঋগ্বেদীয় দৃষ্টিতে মুনির মর্যাদা খুব উচ্চ নয়। বাতরশন, অর্থাৎ বায়ুর মতো দ্রুতবক্তা, পিলঙ্গ, মলিন-বসন-ধারী মুনি সম্ভবত ঐহিকতা-বাদী, ভোগবাদী ও সুখবাদী ঋগ্বেদীয় আর্যদের প্রিয়পাত্র নন। অথর্বমন্ত্রে মুনির দীর্ঘকেশ গর্ভ-বিনাশক রক্ষস্-এর বিকট মূর্তি কল্পনা করতে সাহায্য করে। বৈদিক আমলের মুনি যদি বৌদ্ধ আমলের শ্রমণের সঙ্গে তুলনীয় হন, সে ক্ষেত্রে মুনির প্রতি অবজ্ঞার অর্থ হতে পারে বেদাচারের বহির্ভূত ছিল মুনির আচরিত ধর্ম-চর্যা। মুনির চর্যাকে প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করেছেন গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডে। যোগ-চর্যা ও দেহতত্ত্বকেও ইদানীং হরপ্পার উত্তরাধিকার-

রূপে গণ্য করা হচ্ছে। নূতনতর গবেষণার ফলে কোন্ ঘাটের জল কোথায় গড়াবে জানি না। যেখানেই আমরা হালে পানি পাই না সেখানেই diffusion বা বহিঃপ্রভাবের সূত্রকে টেনে আনি, আবার উল্টো দিক দিয়ে বেদ থেকে ভাগবত পর্যন্ত একটানা বিবর্তনের প্রমাণ খুঁজি। সহজতর বিবেচনায় হিন্দুধর্মের সবকিছুই আর্য-প্রতিভার অবদান নয়, আবার আর্যদের মধ্যে যজনাচার ছাড়া অন্য আচার ছিল না এমন ধরনের অনুমানও একপেশে। ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে, প্রথম ও দশম মণ্ডলে, এবং অপরাংশেও রহস্যবাদের সূচক মন্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে। অথর্ব-মন্ত্রে দেহতত্ত্বের প্রাথমিক বিবৃতি দেখতে পাই। অথর্ববেদীয় উক্তি অনুসারে দেহ হচ্ছে দেবাধ্যুষিত, অষ্টচক্র যুক্ত এবং নবদ্বার বিশিষ্ট, এর ভিতরে জ্যোতির দ্বারা আবৃত হিরন্ময় কোষের অভ্যন্তরে বিরাজ করছেন আত্মার অধিকারী যক্ষ। এই উক্তি অবলম্বনে রহস্যবাদ চরমে পৌঁছেছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। বৈদিক মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বোধ হয় রহস্যবাদ, বৈদিক রূপক-বিশ্লেষণে বহুস্থলে রহস্য-চেতনা (Sense of mystery) প্রকটিত হয়। রহস্যবাদ ও দেহতত্ত্ব পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও দুটি এক জিনিস নয়, দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগ-চর্যার সম্পর্ক নিবিড়তর। ঋক্‌মন্ত্রে নিন্দিত মুনি দেহতত্ত্বের সাধক কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু মুনির আচারে যোগ-সাধনার কিছু কিছু লক্ষণ হয়তো ছিল এবং এ বিষয়ে পৌরাণিক জনশ্রুতি-গত নজীরও রয়েছে। যজনাচারের বিরুদ্ধ ছিল মুনির আচার, এই কারণে মুনি-চর্যার অনার্যত্ব প্রমাণিত হয় না, কেন না আর্যদের একাংশে যজনাচারের সমর্থন মিলত না, বৈদিক দৃষ্টিতে তারাও ছিল বিদূষণের পাত্র। পুরুষ সূক্তে পুরুষের দেহ হচ্ছে সৃষ্টির উৎস—এ ধরনের দার্শনিক কল্পনায় দেহতত্ত্বের ভাবধারার ইঙ্গিত থাকতে পারে। আবার, আর একটা বিষয়ও সমস্যার জটিলতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হোকার্ট বলেছেন যে পুরুষসূক্তের অনুরূপ সৃষ্টি-কল্পনা স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ায় এবং গিলবার্ট দ্বীপেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং যোগ-চর্যা বা দেহতত্ত্বের ব্যাপারে হরপ্পার যোগী-চিত্র চরম সমাধান-রূপে বিবেচ্য হতে পারে না। [ঋ ১০।১৩৬।২ ; pp. 257-261, *Studies in the origin of Buddhism*, Pande ; অথর্ব ১০।২।৩১, ৩২ ; তৈ আ ১।২৭।২, ৩ ; p. 22, *Social Origins*, A. M. Hocart, 1954]

জন্মান্তরবাদের ক্ষেত্রেও অনার্য উৎসের সম্ভাবনা থাকলেও প্রচুর জটিলতা রয়েছে। জন্মান্তর বিশ্বাসের একটি পর্যায় হচ্ছে অবতার-বাদ, যার সূচনা

দেখা যায় প্রজাপতির বরাহ-রূপ ধারণ-সম্বন্ধীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার উপাখ্যানে। প্রাচীন ইরানীয় বিশ্বাসে বেরেথ্রঘ্নের দশ অবতার কল্পিত হয়েছে এবং তাদের একটি হচ্ছে শূকর। বাহ্‌রাম যস্তের বিবরণ বিষ্ণুর দশাবতার-কাহিনীর সজাতীয়। গ্রীক মেটেম-সাইকোসিস-এর (metempsychosis-এর) ধারণাও পুনর্জন্মবাদের একটি সংস্করণ মাত্র এবং অর্‌ফিক (orphic) সম্প্রদায়ও পীথ্যাগোরীয় গুপ্ত সমিতিতে বরাবর অনুশীলিত হয়েছে। এই বিশ্বাসের পরিপোষক হিসেবে এম্‌পিডোক্লিস, পীথ্যাগোরাস, প্লেটো, ফিলো, প্লোটিনাস এবং একালের জার্মান দার্শনিক লেসিং আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মাশ্রিত ম্যানিপন্থী (Manichaeans) এবং য়িহুদী ক্যাবালাবাদী (Cabbalist) গোপনে জন্মান্তর-রহস্যে বিশ্বাস করতেন এমন প্রবাদ আছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাবের কথা বলেছেন অনেকে। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ কিংবা বিভিন্ন রূপে অবস্থিতি বিষয়ে বিশ্বাস আবিষ্কৃত হয়েছে ইংলণ্ড ও জার্মানির লৌকিক ধর্মে, ড্রুইডদের ধর্মীয় জনশ্রুতিতে। সুতরাং জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের সহজ উত্তর সম্ভব নয়। অনার্য উৎসের প্রকল্প নিশ্চয়তার দাবী করতে পারে না। [তৈ সং ৭।১।৫ ; pp. 226-234, *The Aryan trail in Iran and India* Nagendranath Ghosh, 1937 ; pp. 99-108, *Sanskrit and Culture*, Goldstucker, 1955]

(সমাপ্ত)

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অধ্যাপক রসময় গুপ্তর ড্রইংরুম-এর একাংশ। ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে স্ত্রী সুহাস-এর সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাশের সেন্টার টেবিলে স্তূপীকৃত বই-এর ধারে ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে খোলা বই-এর ওপর। ছায়াচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশে মনই যেন জোরে কথা কইছে মানুষের চেয়ে। সুহাস অবাক হয়ে শুনছেন রসময়ের কথা।

রসময় :…তারপর বহু বহু তপস্যার পর দেবতা যখন প্রসন্ন হলেন, কল্যাণহস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন বরদান নিয়ে, জপতপে দ্বিধাগ্রস্ত বিশীর্ণ ব্রাহ্মণ তখন দূর ছাই বলে হন্ হন্ করে ফিরে চল্লেন এই ভাবতে ভাবতে যে, আমার এতদিনকার জপতপ আচার অনুষ্ঠান সব মিথ্যে, সব পণ্ডশ্রম মাত্র ; কেউ নেই কিচ্ছু নেই। ভগবানই যখন নেই তখন আর ভগবৎ কৃপা হবে কোত্থেকে, বোঝ ব্যাপার! তা আমাদেরও হলো খানিকটা ঐ অবস্থা। আমাদের তবু ছ্যাখো নেই সুকৃতি, নেই কর্মগুণ, নেই সেই নিষ্ঠা, তবু বলা যায়—অনায়াস লব্ধ সেই বরদান, অর্থাৎ স্বাধীনতা যখন আমরা পেলাম, তখন তার সত্যশিব স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম না। স্বপ্ন যদি বা সার্থক হলো কমলাকান্ত-র তবু আমরা মড়াকান্ত তখনও ঘুমিয়ে রইলাম। নিষ্ঠার অভাবে দশহাতে সেই জাগ্রত বিগ্রহকে আমরা সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারলাম না দেশের বেদীতে। শঙ্কাহত মন, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র—কি করে কি হবে? দলগত মত ও পথের অমিল সব জানি, সব মানি ; কিন্তু আমার রঙ-এ রং মিলিয়ে ঠাকুর এলো না বলে

তো আর ঠাকুর মিথ্যে হয়ে যায় না। অতএব প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে। যাগযজ্ঞ পুজোপাঠ পুরোদমে শুরু করে দিতে হবে। বিঘ্ন হবে, বিঘ্ন যাবে। তা বলে ভয় করলে চলবে না, বীতস্পৃহ হলে হবে না। তবেই সেই রূপ সাধকের কাছে প্রতিভাত হবে—সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃমূর্তি।

সুহাস : সত্যিই তো! সর্বদেশে সর্বকালে তাই তো হয়ে এসেছে। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

রসময় : না না, তর্ক থেকেও বিশ্বাসটা রাখতে পারা যায়। যে বিশ্বাসের জোরে পাঁচ ঢং-এর পাঁচটা ছেলে মা-কে দেখে গদগদ হয়, আনন্দ করে একসাথে।

সুহাস : সে তো আমার ক-টির দিকে তাকালেই আমি বুঝতে পারি, তারা যাই বলুক।

রসময় : আহা সে তুমি বুঝতে পারো। তারা ঠিক ঠিক পারে কি? আছে সে বোধ?…এক একজন তো দিকপাল হয়েছে। বল, কি করলে কংশ, কি করলে বীরু, অমলই বা কী করছে!

সুহাস : সে আর বলে কি হবে! অদৃষ্ট, কপাল!

রসময় : এতটা অদৃষ্টবাদী তুমি ছিলে না বলেই আমি জানতাম।…যাগগে!

সুহাস : যাই দেখি আবার সংসার সামলাইগে।

রসময় : বীরু একজন কি কাণ্ডটা করলে শেষটায় ভাবতে পার?

সুহাস : ও তো বলে কণ্ট্রাকটরের দোষ। ভেতরকার ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ ও জানত না।

রসময় : ও কি বলে সেটা তো বড় কথা নয়, লোকে কি বলছে?—খবরের কাগজ?

সুহাস : কাগজওয়ালারা সব টাকা খেয়ে তিলকে তাল করে লিখছে।

রসময় : গবর্নমেণ্ট কাগজওলাদের সব ঘুষ দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেমন? কী যে সব বোধ তোমাদের!

সুহাস : আমার ছেলে চোর, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

রসময় : তোমার ছেলে যে সাধু নয় সে কথা তো কংশই কোর্টে প্রতিপন্ন করেছে।…লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না ; মাথা হেঁট করে হাঁটি।…কে!—কে!…

নেপথ্য কণ্ঠ : আমি বীরু।

…থাক এ সব কথা এখন। ভেতরে আসতে বল বীরুকে।

সুহাস : কই, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয়।…

[বীরুর প্রবেশ]

…কি খবর বল।

বীরেশ : খবর মোটামুটি ভালোই। তুমি কেমন আছ?

সুহাস : আমি আবার খারাপ কবে থাকি! বোস, চা নিয়ে আসি।

[সুহাস-এর প্রস্থান]

রসময় : তারপর…

বীরেশ : তারপর আর কি!—এখন inquiry বসবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

রসময় : বাঘটা কে শুনি?

বীরেশ : বাঘ…

রসময় : হ্যাঁ কে সে বাঘ?…বাঁধতে গিয়ে বাঁধ ধ্বসে গেল, এটাও তো কোনো কাজের কথা হলো না।…গোটা জলস্রোতটাই তো রক্ত! মানুষের রক্তজল করা পয়সার রক্ত। গবর্নমেন্টের টাকা মানে কি বলতে পার?…যাগগে, অনর্থক মাথা খারাপ করে কোনো লাভ নেই!…তেজেশবাবুর কাছে গিছলে?

বীরেশ : গিছলাম।

রসময় : কি বল্লেন তেজেশ?

বীরেশ : বললেন, তুমি তোমার তরফ থেকে কাগজপত্তরগুলো সব দাখিল করো, আমি একবার দেখবো গোটা ব্যাপারটা।

রসময় : তাই দাও। Assembly-তে ব্যাপারটা ওঠবার আগেই দাও তাড়াতাড়ি করে। তৈরি আছে সব কাগজপত্তর?

বীরেশ : তৈরি হয়ে যাবে।

রসময় : চটপট করে দাও। সামনেই আবার সেশন।

বীরেশ : না তার আগেই হয়ে যাবে।

রসময় : আর, পরামর্শ-ই বা কি দেব, কেন দেব বুঝতে পারি না। কাগজপত্তরগুলো দাখিল করবার আগে আশু-কে একবার দেখিয়ে

নিও। আশুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার খানিকটা কথা হয়েছে। …কোর্টে নয়, বাড়িতে যেও।

বীরেশ : আচ্ছা। কবে যেতে হবে।

রসময় : সে আমি তোমায় বলবখন। তদ্বির তদারক—জীবনে এ সব কাজ কোনোদিন করিও নি,—আজ তোমাদের জন্যে…। সোমবার নাগাদ খবর নিও।

বীরেশ : আচ্ছা। আমি তাহলে চলি।

রসময় : এসো।

(রসময় বই পড়তে থাকেন)

[সুহাস-এর পুনঃপ্রবেশ]

সুহাস : বীরু কি চলে গেল নাকি?

রসময় : বোধ হয় চলেই গেল।

সুহাস : আর আমি চা নিয়ে এলাম পড়ি কি মরি করে।

রসময় : ভুলে গেছে আর কি! আমাকেই দাও তবে।

সুহাস : ছোট বৌমার কাছে বেয়াই মশাই-এর খবর শুনলুম।

রসময় : কি বলছিলেন?

সুহাস : সে নাকি সব সাংঘাতিক কাণ্ডবাণ্ড করছেন বাড়িতে। কখনও গলায় ক্ষুর দিচ্ছেন, কখনও ছাত থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছেন, বাড়ির লোকজন সব সময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে ওঁকে নিয়ে।

রসময় : ছাব্বিশ লাখ টাকা ঘাটতি; নাড়ীর-ও তো একটা হিসেব আছে রক্তচাপ সইবার। Every action has its reaction. শুরু হয়ে গেছে প্রতিক্রিয়া আর কি! শিরা উপশিরা সব বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।…খালি গরল উঠছে, খালি গরল উঠছে।…সবটুকু অমৃত এবার মনে হচ্ছে দানবেই খেয়ে ফেলেছে। দেবতাদের ভাগ্যে ছিঁটেফোঁটা জোটে নি।

সুহাস : সত্যি কি হবে বল তো?

রসময় : সেই হিসেবই তো করছি রোজ। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কি জান সুহাস, সবটা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। Sometime, someday, myth will come true. Books

on brooks—sermons on stones. Can atom split an idea, an ideal ?

(সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুর পতনের শব্দে সচকিত হন রসময়। সেই দিকে তাকান। যুগপৎ নিভে যায় আলো। পাশের সংলগ্ন সেটের আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় অমল তার স্ত্রী লতার সঙ্গে তীব্র কলহ করছে। উন্মত্তের মতো সব কিছু টেনে টুনে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে আর চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে লতা—ফুঁসছে, গজরাচ্ছে, সর্পিনীর মতো)

অমল : you lie—তুমি আমাকে কক্ষনও সে কথা বল নি। This is all but a conspiracy. তোমার বাবা আর দশটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না ?

লতা : না, একদিন দেরি হলে তাঁর হাতে হাতকড়া পড়তো। Public money—তুমি বুঝতে চাইছো না কেন ?

অমল : কিন্তু রঞ্জনকে আমি কথা দিয়েছি যে by 12th আমি তার টাকা দেব।

লতা : কথা দিয়েছো দেবে সে টাকা তুমি যেথান থেকে হোক। আমার বাবা তোমার ব্যক্তিগত দেনা মেটাতে বাধ্য নন। বিপদে পড়ে তিনি আমার কাছে তাঁর টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন মাত্র। এ টাকায় তোমার কোনো অধিকার থাকতে পারে না।

অমল : যদি অনধিকার চর্চা করি।

লতা : মুশকিলে পড়বে। তাঁর ভুল হয়েছিল তিনি বিশ্বাস করে তোমার মতো একজন ঠগ-এর কাছে···

অমল : লতা!

লতা : তুমি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো। কিন্তু আমি মেয়ে হয়ে কক্ষনও তাঁকে প্রতারণা করতে পারবো না। তুমি সে টাকা, সোনা, সব ফেরৎ দেবে।

অমল : তাল তাল সোনা আর বুলিয়ন টাকা গচ্ছিত হলেও তার কিছু আমার ছিল। সুতরাং কিছু পাবে, কিছু যাবে। তোমার বাবাকে বলো···

লতা : অসম্ভব, তার একটি পয়সাও তুমি তাঁকে প্রতারণা করতে পার না।

অমল : প্রতারণা নয়, আমার নেয্য প্রাপ্য।···

[আলমারি খুলে টাকার থলে বার করে আনে]

···এই আছে, নিয়ে যাও। নাও। ক্ষুদ্র স্বার্থের মহত্তর ব্যাখ্যা দিয়ে আজ তুমি তোমার বাবাকে তৈরি করছো সাধুপুরুষ, আর আমাকে বানাচ্ছ চোর, ছিঃ।

লতা : তা যদি করতাম তো ভিক্ষে করে রঞ্জন রায়ের কাছ থেকে টাকা এনে তোমার পৈতৃক মর্টগেজী সম্পত্তির খানদান রাখতাম না। সব ধুয়ে মুছে যেত এতদিনে। তুমি নেমকহারাম, তাই নুন খেয়েও গুণ গাইতে পারছ না।

অমল : যাও, কীর্তন বার কর গিয়ে এবার রঞ্জন রায়ের নাম করে। আমি কোনোদিন তোমাকে রঞ্জন রায়ের কাছে আমার জন্যে হাত পাততে বলি নি।

লতা : রঞ্জন রায়ের কাছে হয়তো হাত পাততে বল নি, কিন্তু কুঞ্জলালের বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দিতে বলেছিলে।···

(অমল বাইরে যাবে বলে কোট পরে তৈরি হয়ে নেয়)

···কোথাও যাচ্ছ! টাকা দিয়ে যাও।

অমল : টাকা নেই, টাকা আমি দিতে পারব না।

লতা : শোন, যেও না, টাকা দিয়ে যাও!

(অমল দৃকপাত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে লতা ঘরের আসবাবপত্র ভাঙতে থাকে। হাতের কাছে যা কিছু সব টান মেরে ফেলে দেয়। ছুটে যায় বন্ধ আলমারির কাছে। ভাঙতে থাকে লাথি মেরে মেরে। চাঁড় দিয়ে আলমারি খুলে ফেলে। তারপর সমস্ত অলঙ্কার ও গহনাপত্র সব কিছু ব্যাগে পুরে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নেপথ্যে কণ্ঠ : বৌমা! অমল! অমল! দরজা খোল,—অমল!

[বেগে রসময় ও সুহাসের প্রবেশ]

রসময় : অমল!

(ভাঙাচোরা আসবাব আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসামগ্রী দেখে হতবাক হন রসময়। স্ত্রী সুহাসের দিকে তাকান বিমূঢ় বিস্ময়ে)

দেখছো! অমল!···অমল বড় বুদ্ধিমান ছেলে! অমল! বৌমাই বা গেলেন কোথায় ?

সুহাস : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রসময় : না বুঝতে আমি ঠিকই পারছি—অমল! শেষটায় অমলও…

সুহাস : কি করেছে অমল!

রসময় : করেছে, একটা কিছু করেছে। একটা কিছু নির্ঘাত করেছে…

(টুকিটাকি ভাঙাচোরা জিনিস কুড়িয়ে বেড়ান খেদ করে)

…আমার সেই ঘড়িটা।

সুহাস : নাঃ, আর রক্ষে হলো না। কংশ গেল, বীরু গেল, বাকি ছিল এক অমল…

রসময় : ছাখো, অমলের ঘর, চেয়ে ছাখো। যে কেউ এসে এখন শুধু একটা দেশলাই-এর কাঠি ঠুকে দিলেই আর কি দাউ দাউ করে জ্বলে যেতে পারে।

সুহাস : (কেঁদে ওঠেন) আমি আর এ বাড়িতে তিষ্ঠুতে পারি না…।

[বেগে প্রস্থান]

সুহাসের আর্তকণ্ঠ শুনতে পান রসময়। স্ত্রীকে অনুসরণ করেন ব্যস্তভাবে। রসময়ের নেপথ্য কণ্ঠ শোনা যায় : অমল!—অমল!

[অমলের প্রবেশ]

(বিভ্রান্ত অমল ঘরের ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। মহাজনর্থের দিকে চেয়ে দেখে। জ্বলতে থাকে তার চোখ। ছুটে যায় আলমারির কাছে। উন্মত্তের মতো ড্রয়ার ধরে টান মারতেই ছিটকে পড়ে ড্রয়ার জিনিসপত্রসমেত মেজেতে। তারপর জামা কাপড়ের গাদা টান মেরে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতে থাকে।)

অমল : আমার এটাচি! আমার এটাচি কোথায় গেল! আমার এটাচি কেস। কোথায় গেল এটাচি! এটাচি!

(রসময়ের নেপথ্য ডাক—অমল! অমল!—তখনও শোনা যাচ্ছে দূরে, কাছে)

(পর্দা)

(ক্রমশ)

ফুল আমার ময়না

রণজিৎ দাশগুপ্ত

উঠোন বরাবর যেতেই
        এক ঝাঁক আধোবুলি
        হুড়মুড় করে জড়িয়ে ধরল।
                লোকটিকে।

নড়তে চড়তে পারে না
পায়ের পাতা ছুটো
        দিব্যি মাটি কামড়ে
                নিঃসাড়।

চোখের তারা নড়ে না
চোখের পলক পড়ে না
মনটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়
যেখানে অজস্র গিঁট দেওয়া সাধ-আহ্লাদের
                গলায়
মোটা রশির ফাঁস পরানো।

তারপর ঝিম্ ঝিম্—তাই-তাই
আধোবুলি খই ছিটোয় :
ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-পা, ধানের ছড়া গোছা গোছা।

আড়ষ্ট হাত
ফুল খুঁজে
ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ চুলে
আড় হয়ে আসে :

ফুল আমার ময়না !
ফুল আমার ময়না !!
ফিসফিস স্বর হাওয়ায় হাওয়ায়
টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ছটফট করতে করতে
কান্না হোল
চোখ

জোকার পড়ল পাড়া কাঁপিয়ে।

সমবেত ইচ্ছার প্রতি

গোবিন্দ গোস্বামী

উৎসে ফিরে যাবো বলে জীবনের শেষ অভিসার
অমৃত উদ্যান হতে অভিষিক্ত প্রেমের দর্পণে
কতো পরিচিত মুখে উচ্ছ্বসিত বসন্ত বাহার
নিপুণ আলাপে শুনি। হৃদয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে

সময়কে ভালোবেসে ভুলে গিয়ে সংলগ্ন প্রবাস
দিয়েছি প্রদীপে আলো। কে যাবে, কে যায় নি এখনো
সম্মুখের পথে যদি আমাদের অভিযান শোনো
তবে এসো, মুছে দিয়ে নেপথ্যের মৃত পরিহাস।

অন্ধকারে পড়ে আছে ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়ের মুখ,
ভুলে যাবো শোকাবহ কাহিনীর নাটকীয় স্মৃতি
কঠিন প্রত্যয়ে দীপ্ত ইস্পাতের মর্যাদা উৎসুক
অন্তরের ইতিকথা, মুছে দেবে নির্বীর্য উদ্ধৃতি।

অমল রক্তের স্রোতে ধমনীর উষ্ণ প্রস্রবণ
জানিনা কী উৎসে যাবে, বেঁচে আছি দৃপ্ত যতোক্ষণ ॥

জন্মের মুহূর্ত থেকে
তাপস বর্ধন

জন্মের মুহূর্তে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি।
বিবেকের আশ্চর্য আঘাতে
আর—
এক মুহূর্ত স্থির থেকে
ঈশ্বরের অসংখ্য সংজ্ঞা লেখা কাব্যের পাতা ছিঁড়ে
শুধুই ভেবেছি।

সেই থেকে
আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রতিটি ধ্বনিই প্রতিধ্বনি,
আমার চোখের আশ্চর্য দৃষ্টি সেই থেকে
নিষ্পলক।

আমি সেই থেকে স্নান করি নি।
বুকের উষ্ণতায় নিষ্ঠুরতা চঞ্চল।
আপাততঃ প্রতিটি সুন্দর ফুল তীর-বিদ্ধ।

অনেক অশান্তি, আগুন ও অরণ্য পার হয়ে
সেই স্নিগ্ধ নির্ঝরে স্নান করে
চোখের পলক ফেলবো।

আবার পবিত্র হব
প্রদীপ চৌধুরী

আবার পবিত্র হব তার আগে
অই সিক্ত কালো চুলে মুখের ব্রণের দাগ মুছে
দিতে হবে
আবার পবিত্র হব পাপের কিংখাবে বসে
প্রতিশ্রুত হলাম।

আবার পূর্ণ হব। নিয়তির নির্মম কুসুমে
মন্দিরের জলে ধোয়া দুহাত রাখব
তার আগে অন্ধের অভিজ্ঞা হতে একটি উজ্জ্বল
দিন দেবে
প্রতিশ্রুতি দাও।

নীল হ্রদ

রতন ভট্টাচার্য

এদিকটা সন্ধের পর থেকেই খুব নির্জন হয়ে পড়ে। লোকজন চলাচল থাকে না। বাসট্রামগুলো কোথাও দাঁড়াতে হয় না বলে চকিতে বেরিয়ে যায়। খুব দৈব বলতে হবে যে এত রাস্তার পর ঘুমটা এখানেই এসেছিল। বরাবরই, কোন্নগর বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়েই, একটা তন্দ্রার মতো ভাব ছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বোঝাই লরিগুলো ছুটছিল। বাস ছুটছিল, তাই তন্দ্রার ভাবটা তেমন গাঢ় হয়ে উঠতে পারে নি। মেজবাবু টের পান নি যে জীবনটা যার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে গা এলিয়ে দিয়েছেন তার সমস্ত শরীর ক্লান্ত হয়ে ঘুম চাইছে।

অবশ্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হাওড়া, হাওড়া ব্রিজ পার হওয়া পর্যন্ত অনিলও বুঝতে পারে নি যে এই তন্দ্রার ভাবটা কোনো নির্জন শান্ত রাস্তা পেলেই গাঢ় হতে চাইবে। সে ঘুমিয়ে পড়বে। গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোড ছেড়ে বাঁ দিকে কয়লাঘাটা স্ট্রিটে ঢোকা পর্যন্ত অনিলের মনে আছে। এই রাস্তায় গাড়ির মুখটা ঘুরলেই তার মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন সে একটা প্রকাণ্ড রানওয়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রকাণ্ড, বিস্তৃত সমুদ্রের মতো এই রানওয়ে তার ক্লান্ত শরীর থেকে ভুলিয়ে মনটাকে বাইরে বার করে এনেছিল। রানওয়ের কোথাও কেউ ছিল না। অনেক দূরে ধু ধু এরোড্রমের কোয়ার্টারগুলো দেখেছিল সে। আর কিছু মনে নেই তার। শেষে সে বুঝতে পারছিল কেউ তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। প্রবল বেগে তার পরিশ্রান্ত শরীরটা ঝাঁকি লেগে জেগে উঠলে সে দেখেছিল তার গাড়ি বড় পোষ্টঅফিসের উঁচু উঁচু প্রাচীন থামগুলোর দিকে মুখ করে ছুটছে। মেজবাবু তার নাম ধরে, তার জামা, শরীর ধরে তাকে ডাকছেন। সেই পেছন থেকেই তার শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে মেজবাবু একহাতে স্টিয়ারিংটা ঘোরাতে চাইছিলেন। তখন আর তার চোখের সামনে কোনো রানওয়ে ছিল না। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে নৌকোডুবি হওয়া মানুষের মতো সে আঁকুপাঁকু করে জেগে উঠেছিল। জেগে উঠে

শক্ত অভ্যস্ত হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিয়েছিল। গাড়ির দুটো চাকা ফুটপাতের ওপর উঠে গিয়ে, ঘুরে, পাক খেয়ে গাড়ি আবার রাস্তায় নেমে এসেছিল। খুবই দৈব বলতে হবে যে আশেপাশে তখন কোনো গাড়ি ছিল না, পথচারী ছিল না। থাকলে···।

অবশ্য অনিল যে খুব একটা ভয় পেয়েছে তা নয়। বস্তুত প্রায় ঘুম আর জাগরণের মধ্যেই সব ব্যাপারটা ঘটে গেল। তার মনের মধ্যে কোনো অনুভূতিই ছিল না। কোনো ভয় বা সদ্য ভয় পাওয়ার পরের কোনো গ্লানি অনিলের ছিল না। গাড়ি ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামবার পর কিছুটা ঘোর, কিছু তন্ময়তার মধ্য দিয়ে এগোলে মেজবাবু বললেন, আর একটু হলেই মেরে ফেলেছিলে হে।

মাথা কাত করে অনিল কাঁচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল, তার কোনো বোধ ছিল না কিন্তু শরীরটা কে জানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ায় এবং ঘুম ভাঙায় কিনা খুব কাঁপছিল।

আমি তো একটু আগেও চোখ বুজে পড়েছিলাম, মেজবাবু বললেন। তারপর গাড়ি আরও এগিয়ে এলে, কার্জন পার্কের কাছে, মেজবাবু আবার বললেন, এটখানে গাড়িটা একটু রাখো। রেখে বাইরে বেরিয়ে একটু গা-টা-গুলো ছাড়িয়ে এসো দিকিন।

গাড়ি কার্জন পার্কের কাছে রেখে অনিল বাইরে এলো। বাইরে হাওয়া নেই। কার্জন পার্কের এদিকটা অন্ধকার। ডান দিকে রাজভবনের উদ্যান। একটু পেছন দিকে সরে গিয়ে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে অনিল ধরায়। বিড়িতে শেষ টান দেওয়ায় শরীরের জড়তা হঠাৎ ঝাঁকি লেগে শরীরের শিথিলরক্ত হাত-পা সব চনচন করে উঠল। তার হাতের ঘড়িতে নটা বেজে গেছে। রাত চারটে থেকে এখন রাত নটা। কর গুনে গুনে অনিল হিসেব করে দেখল, চারটে থেকে চারটে, বারো ঘণ্টা আর পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় মোট পাঁচ আর বারো সতেরো ঘণ্টা সে জেগে আছে। স্নান এবং খাওয়ার এক ঘণ্টা বাদ দিলে মোট ষোল ঘণ্টা সে তার এই লম্বা দেহটা ভাঁজ করে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। কোনো অবকাশ তার ছিল না। কার্জন পার্কের পাশে নির্জন ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে এখন তার শরীরটা কি রকম ভেঙে আসতে চাইল। বিড়ি টানা সত্ত্বেও দু বার খুব হাই উঠল। কেন আজ ক-মাস ধরে তার এ রকম হচ্ছে কে জানে? সে

দশ বছর ধরে ড্রাইভারি করছে। এর আগে কোনোদিন তার এমন হয় নি। তার মনে পড়ে না গাড়ি চালাতে চালাতে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সে আর কোনোদিন ঘুমিয়েছে কিনা। গাড়িটা সোজা বড় পোস্টাপিসের সিঁড়িতে ধাক্কা লেগে কাত হয়ে উল্টে পড়লে এখন সে কোথায় থাকত। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় কোনো হাসপাতালে। মরে গেলে···? হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙার পর চোখ মেলে দেখা একটু আগের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ায় অনিলের সমস্ত শরীরে একটা মৃদু শিহরণ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। দেহ অবশ করে হাই উঠল তার।

কিহে, মেজবাবু গাড়ি থেকে মুখ বার করে ডাকলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

অনিল বিড় বিড় করে মৃদু জড়ানো গলায় কিছু বলল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠল সে। গাড়িতে স্টার্ট দিতে তার মনে হলো গাড়ি আর আপনি যাবে না। যেন এই গাড়ি এখন তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। ঘুম পাবার জন্যে বা সারাদিন বসে আছে বলে, যে জন্যেই হোক, তার কোমড় আর ঘাড়ের কাছে একটা ব্যথা মাঝে মাঝে খুব ঠেলা মেরে উঠছিল।

ঘুম গেল, কিহে ? গাড়ি চললে মেজবাবু সিগারেটে সুখ টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হুঁ।

একটু আগে মেজবাবু যে প্রায় একটা গুরুতর এ্যাকসিডেণ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, এখন আর তাকে দেখে সে কথা অনুমান করবার উপায় নেই। পেছনের গদিতে শরীর ছেড়ে দিয়ে মেজবাবু এলিয়ে বসে আছেন। হাওয়ায় তাঁর পাঞ্জাবি, চুল উড়ছে।

শরীর-টরীর খারাপ করেনি তো···? মেজবাবু জানতে চাইলেন।

অনিলের কথা বলতে ভালো লাগছিল না। সে প্রথমে মাথা ঝেঁকে না করল। তারপর হয় তো তার মাথা ঝাঁকা মেজবাবু দেখতে পেলেন না মনে করে শেষে বলল, না।

তবে, হঠাৎ ঘুম পেল যে ?

কথা বলতে অনিলের সত্যি খারাপ লাগছিল। তার কপালের দু-পাশের রগ দুটো ফুলে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে খুব রেগে গেলে তার এ রকম হয়। তার বুঝতে বাকি নেই মেজবাবু বাড়ি পর্যন্ত এই রাস্তা তার সঙ্গে এতো

কথা বলে তাকে জাগিয়ে রাখবে। অনিলের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল হঠাৎ গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে গাড়িটাকে অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। দিয়ে পেছনে বসে থাকা এই লোকটাকে দু-হাতে গলা টিপে মেরে ফেলে। তারপর কাজ শেষ হলে মাঠের নরম ঘাসে, চারপাশ খোলা হু হু শীতল হাওয়ায় দেহ বিছিয়ে দিয়ে সারারাত সে শুয়ে থাকবে।

কি ব্যাপার হে ? আবার ঘুমুলে নাকি ?

অনিল কথা না বলে তার বিরক্ত মুখটা মেজবাবুকে দেখাল। প্রথমে মুখ ঘোরাবার সময় ভেবেছিল একটু হাসবে, কিন্তু হাসতে ভালো লাগলোনা। শেষে তার কথা না বলা এবং বিরক্ত হওয়াকে গ্রাহ্য করার কোনো উপযুক্ত কারণ মেজবাবুর নেই এবং তাই মেজবাবু রেগে যেতে পারেন ভেবে অনিল দু বার হাই তোলার ভাব দেখিয়ে বলল, সেই রাত চারটেয় গাড়ি বার করেছি। বিশ্রাম নেই···।

রাত চারটেয় ! মেজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, রাত চারটেয় কেন গাড়ি বার করেছিলে ?

কত্তা-মা গঙ্গায় যান না ?

ও হ্যাঁ। মেজবাবু একটু থেমে বললেন, কিন্তু সে তো তোমার রোজই যেতে হয়।

হুঁ, রোজ যাই। অনিলের জিভ শুকিয়ে গলা বুজে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল তার দু চোখ কেউ ভেতর দিকে টানছে। কথাবার্তা তার ভালো লাগছিল না। এই কথাবার্তা শেষ করে দিতে চেয়ে তাই সে বললে, ক-মাস ধরে এ রকম হয়েছে। সব সময় ঘুম পায়। কথা বলতে বলতে, বসে বসে, গাড়ি চালাতে চালাতে চোখ বুজে যায়। ঘুম পায়।

মেজবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ঘুম তোমার পুরো হচ্ছে না হে।

অনিল অন্ধকারে ভেংচি কেটে মনে মনে বললে, ঘুম তোমার পুরো হচ্ছে না হে।

গাড়ি জনহীন মাঠের ধার ছেড়ে জনবসতির ভেতর দিয়ে ছুটছিল। এঞ্জিন রোড পার হয়ে গাড়ি এখন একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। এই গলি-রাস্তার শেষে বড় ছড়ানো তিনতলা বাড়ি, বাগান, ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, উঁচু গেট, বাগানের মধ্যে আধা হাউস, একসারি পামগাছ, গাড়ি সেখানে এসে গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। গাড়ি ঝাঁকি খেয়ে থামলে

অনিলের মনে হলো গাড়ি থেকে নেমে বাইরে বেরোবার শক্তি তার শরীরে নেই। যেন আজ সমস্ত দিন সে একটা দীর্ঘ মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এই মাত্র এখানে এসেছে। মরুভূমির নিষ্ঠুর উত্তাপ তার শরীর থেকে সব রক্ত শুষে নিয়েছে। হাত পা কোনো রকমে টানটুন করে স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে সে যদি এখন চিৎকার করে বলতে পারত, আমি আর বেরুব না। বেরুব না। এই সব ভাবতে ভাবতে সে গাড়ি থেকে নেমে মেজবাবুর জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। মেজবাবু একদিকে সরে আসতে গাড়িটা একদিকে কাত হয়ে গেল। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। দু-হাত মাথার ওপর উঁচু করে রেখে আলস্য ত্যাগ করলেন। ভেতরের আলোকিত হল, সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন দুর্গা···। দুর্গাবুড়ো যেন তৈরি হয়েই কোথাও এদিকে ছিল। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো সে সামনে এসে দাঁড়াতে মেজবাবু তাকে বললেন, গাড়ি থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে আন রে···। বলে পেটের কাছে কোঁচাটাকে শক্ত করে চেপে ধরে ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরের হলে শেষে সিঁড়িতে তাঁর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণে অনিল গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে চোখ বুজেছে। দুর্গা বুড়ো মাল-পত্তর গাড়ি থেকে নামালে সে গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে······ খাওয়ার কথা তার মাথায় ছিল না, দুর্গাবুড়ো যখন হোক তাকে ডেকে তুলে খাওয়াবে···গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে কোনো রকমে ঘরে গিয়ে সে টান হয়ে পড়ে যাবে। মেজবাবু ভেতরে ঢুকে যেতে দুর্গাবুড়ো গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, ড্রাইভারদা···।

অনিল তার রক্তবর্ণ, নিস্পৃহ দুচোখ তুলে দুর্গাবুড়োর দিকে তাকাল।

ছোটবাবু টং···। দুর্গাবুড়ো হাত নেড়ে চোখমুখের একটা ঈশারা করল। না মেজবাবু গাড়ি নিয়ে কোন্নগর চলে যেতে···। কথা সে শেষ করল না। না করে বললে, গাড়ি এখন তুলো না যেন। ছোটবাবু, ছোটমা বালিগঞ্জ যাবে গুরুদেবের বাড়ি।

এই এখন! অনিল অবাক।

হ্যাঁ।

অনিলের সর্বশরীর বেয়ে একটি তীব্র শীতল শীহরণ নামল। তার গা হাত পা সব ভোরের ঝাউগাছের মতো ঝিরঝির শব্দ করে কাঁপছিল। সে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারছিল না। কথা বলতে গিয়ে সে দেখল তার

শুকনো, গলা দিয়ে ফাঁপা নিঃশব্দ একটা হাওয়া বেরিয়ে আসছে। পারব না, যেন নিজেকে শোনাচ্ছে এমনি করে সে বলল, আমি পারব না। বালির ওপর জোরে হাওয়া বইলে যেমন হয় তার গলার স্বর সে রকম শব্দ করে বেজে উঠল। গাড়ি থেকে চারটে লাউ, কিছু ঢ্যাঁড়স, কোন্নগর বাগান বাড়ি থেকে আনা তরকারী, ফুল নামাতে নামাতে দুর্গাবুড়ো ফিরে চাইল। কি হচ্ছে ড্রাইভারদা ?

অনিল দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এলো। ঘুমে আমি চোখ খুলতে পারছি না বুড়ো।

তরকারী নামাতে নামাতে দুর্গাবুড়ো থেমে, দাঁড়িয়ে পড়ে অনিলকে দেখল। ড্রাইভারদা একটা ডাক্তার দেখাও। এ তোমার অসুখের ঘুম।

অসুখ!

হ্যাঁ। কই আগে তোমার এমন ছিল না তো ?

ঠিক। আগে তার এমন ঘুম ছিল না। আগেও সে রাত চারটের উঠেছে। কত্তা-মাকে নিয়ে গঙ্গায় গেছে। আবার এদিকে কেউ সন্ধে-বেলাতেই তাকে শুতে পাঠায় নি। শুতে শুতে প্রায় বারোটা। কিন্তু আগে কই কোনোদিন ঘুমে এমন হয়েছে মনে পড়ে না তো। দেড়-দুমাস হলো এই ঘুম তাকে পেয়েছে। যখন তখন, যেখানে সেখানে তার ঘুম পাচ্ছে। মেজবাবুই ঠিক বলেছেন, ঘুম পুরো হচ্ছে না।

আজ কোনো হুজ্জ্যত করো না ড্রাইভারদা। ঘুরে এসো। দুর্গাবুড়ো ফুল, তরকারী নামিয়ে বলল, সন্ধেবেলা কত্তা-মার ঘরে বড় বাবু, ছোটবাবু সবাই মিলে খুব মিটিং হয়ে গেছে। গাড়ি কোন্নগর নিয়ে আটকে রাখায় মেজবাবুর ওপর খুব চটেছে সকলে। বলতে বলতে দুর্গাবুড়ো আলোকিত প্রায় ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তিকে চেঁচিয়ে ডাকল, কানাইয়ের মা···।

ছায়াটা একটু নড়েচড়ে এগিয়ে এলে দুর্গাবুড়ো বলল, ধরতো বাছা এই গুলো, নিয়ে এসো আমার সঙ্গে, হ্যাঁ। তারপর কোঁচড়ে ঢ্যাঁড়স, বগলে দুটো মোচা, দুহাতে লাউ, কানাইয়ের মায়ের দুহাতে লাউ, ফুল এসব নিয়ে দুর্গাবুড়ো আর কানাইয়ের মা চলে যেতে অনিল গাড়িবারান্দার নিচে প্যান্টের পকেটে হাত রেখে একটি মৃতবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাত চারটেয় উঠেছে সে। আর এখন পৌনেদশটা। প্রায় আঠারো

ঘণ্টা জেগে আছে। চারটেয় উঠে সে কত্তা-মাকে নিয়ে গঙ্গায় গেছে। ফিরে এসে বড়বাবুর মেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে। তারপর সাড়ে আটটার সময় বড়বাবুকে নিয়ে কারখানা। বড়বাবুকে কারখানায় পৌছে দিয়ে ফিরে এসে বড়বাবুর বড়মেয়ে বিমলা দিদিমণিকে নিয়ে কলেজ। বিমলা দিদিমণিকে কলেজ পৌছে দিয়ে ফিরে এসে ছোটমা শ্যামবাজার তার বাপের বাড়ি গেছেন। তারপর ছোটবাবুকে নিয়ে কারখানা। ছোটবাবু কারখানায় গেলে, বড়বাবু ফিরে এসেছেন। তখন চান খাওয়ার জন্যে সে একঘণ্টার ছুটি পেয়েছে। খেয়ে উঠেই বড়মাকে নিয়ে বেরোতে হয়েছে। বড়মা বাজার করে ফিরে এসেছেন তিনটেয়। তারপর মেজবাবু, মেজবাবু প্রথমে কারখানার সব পার্টিদের বাড়ি ঘুরেছেন। পাঁচটা নাগাদ কোন্নগর। সেখানে বাগানের মালীর সঙ্গে তাকে তরকারী ফুল তুলতে হয়েছে। ভাবতে ভাবতে অনিলের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠলো। সারাদিন সে একটা চরকির মতো ঘুরেছে। রোজ ঘোরে। এখন আবার তাকে যেতে হবে বালিগঞ্জ। ছোটবাবু ছোটমার গুরুদেবের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে রাত কত হবে কে জানে? সাড়ে এগারো, বারো, বেশিও হতে পারে। তারপর সে শোবে। শেষে রাত চারটের সময় এসে দুর্গাবুড়ো তাকে ডাকবে, ড্রাইভারদা ওঠো। উঠে পড়ো। চারটে বেজে গেছে। কখনও কখনও তার মনে হয়···। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হলো। শব্দটা নিচে নেমে আসছে। হঠাৎ কোনোদিন ঘর্মাক্ত দেহে এক ঝলক হাওয়া লাগলে যেমন হয় অনিলের সমস্ত দেহ তেমনি শীত করে কেঁপে উঠল। এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করছিল সামনের গাড়িটাকে সে একটা খেলনার মতো উঁচু করে তুলে আছড়ে ভেঙে ফেলে। চুরমার করে দেয়।

সিঁড়ির পদশব্দে আলোকিত হল পেরিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে অনিল গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রথমে ছোটবাবু তারপর ছোটমা গাড়িতে উঠলেন। ছোটমার টুকটুকে শরীর থেকে নানারকম উগ্র জটিল গন্ধ গাড়ি বারান্দার চত্বর ছাড়িয়ে বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে অনিলের মনে হলো তার একটা বমি বমির ভাব হচ্ছে। আর যেন মাথাটা ঘাড় থেকে এখুনি ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

গাড়ি বাগান পেরিয়ে গেট দিয়ে বাইরের গলি-রাস্তায় এলো। যদিও

জানা ছিল তবু কোথায় যেতে হবে একবার জিজ্ঞেস করবে কিনা অনিল ভাবল। অথচ তার কথা বলতে একদম ভালো লাগছে না। গাড়ি বড় রাস্তায় পড়তে ছোটবাবু বললেন, বালিগঞ্জ, গুরুদেবের বাড়ি। এদিকের রাস্তাও এখন বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে। ট্রাম বাস চলছে কম। লোকজন কম, কোথাও মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে। শীতল হাওয়ায় অনিলের দু-চোখ আঠার মতো জুড়ে আসছিল। তার মাথার ভেতরটা শূন্য, যেন সে ক্রমশই একটা গভীর কুয়াশার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যেখানে সে নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে না। অনেক দূরে গির্জার ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনির মতো ছোটবাবু আর ছোটমার কথোপকথনের শব্দ ভাসছিল। এবারে মেজদা খুব জব্দ হবে। ছোটমা হাসতে হাসতে বলছিলেন।

মেজকর্তাকে জব্দ করা সোজা নয়। ছোটবাবু একটু থেমে বললেন, মেজ বৌঠান খুব চালাক।

ছোটমা হঠাৎ বললেন, মেজদির আর ছেলেপুলে হবে না।

কি করে বলছ?

না। মনে হয়, আবার ছোটমার হাসির শব্দ শোনা গেল।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। অনিলের খুব খারাপ লাগছিল। সে চাইছিল সারাক্ষণ এমন চুপচাপ থাকুক। শুধু গাড়ির একটানা মৃদু ক্লান্তিকর শব্দ। তারপর ছোটমার খুব চাপা প্রায় ফিসফিস গলা শুনতে পেল অনিল, আমাদের কি হবে?

এবারে ছোটবাবু হাসলেন, সে তুমি ভালো জানো।

বারে, আমি কি জানি। সুখে ছোটমার গলা বুজে আসছে অনিলের মনে হলো।

কে জানে?

কেউ জানে না। বলে হাসেন ছোটমা। একটু চুপ করে থেকে বলেন, যদি মেয়ে হয়ে যায়।

তবেই হয়ে গেল। ছোটবাবুর স্পষ্ট নিশ্বাস পড়ল। মা ফিরেও চাইবে না আমাদের দিকে। বড়কর্তার অবস্থা হবে।

ছোটমা গাঢ় স্বরে বললে, ভয়ে আমার ঘুম হয় না। সারারাত বিছানায় ছটফট করি। ঘুমুতে পারি না।

উত্তরে ছোটবাবু কি বললেন অনিল শুনতে পেল না। আমার ঘুম হয় না—

ছোটমার এই কথা তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। তার বুকটা তিরতির করে কাঁপছিল।

গাড়ি তীরের মতো ছুটছিল। বাঁদিকে বেঁকে গাড়ি রাসবিহারীতে ঢুকল। অনিলের মনে হচ্ছিল যে কোনো পাহাড়ী চা-ক্ষেতের ঢালু আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশ স্তব্ধ। কেউ যেন রাত্রির আলো ছড়িয়ে রেখেছে। মাথার ওপর কোথাও তীব্র শব্দ করে একটা এরোপ্লেন উড়ছে। অথচ নির্মল, নির্মেঘ আকাশে কোনো এরোপ্লেন ছিল না। শুধু শব্দ। ভীষণ তীব্র শব্দ।

এই রাস্তা নির্জন। দু-পাশের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বল্পালোকে রাসবিহারী এভিন্যুকে কোনো স্বপ্নের রাজপথ মনে হচ্ছিল। দেশপ্রিয় পার্ক, প্রিয়া সিনেমা ছাড়িয়ে গুরুদেবের দোতলা ফ্ল্যাট। গুরুদেবের বাড়ির মধ্যে গাড়ি যায় না। গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড় করাতে ছোটবাবু ছোটমা গাড়ি থেকে নামলেন। নেমে ভেতরে চলে গেলেন।

অনিল গাড়ি ব্যাক করে পাশের গলি রাস্তায় গাড়িটাকে ঢোকাল। তারপর সারাদিন পর পা টান করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার সমস্ত দেহটা গাড়িতে ধরল না। পা টান করতে চেয়ে তাকে পা গদি থেকে নামিয়ে দিতে হলো। আজ দশ বছর সে ড্রাইভারি করছে। শুয়ে চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সারাজীবন তাকে এই কাজ করে যেতে হবে। এই ড্রাইভারি। তার মনে হলো যেন কোনো গভীর অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের হাত তাকে ড্রাইভার করে দিয়েছে। শরীরের যন্ত্রণাবোধ এখন আর তার ছিল না। কোথাও কোনো যন্ত্রণা আছে কিনা সে বুঝতে পারছিল না। ঘুম ঘুম। তীব্র, গাঢ় ঘুমের একটা ছায়া তার চোখ মুখ শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন ছোটবাবু আর ছোটমা ফিরে এলেন। ছোটমা গাড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন, অনিল।

অনিল চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তার মাথায় কিছু ছিল না। কে তাকে ডাকছে সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ছোটমা আবার ডাকলেন, অনিল।

খুব শান্ত, খুব ধীর স্থির হয়ে সে উঠে বসল। এখনও তার চারপাশে একটা গভীর কুয়াশা।

ছোটবাবু গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, ড্রাইভারদের এই স্বভাব। একটু ফাঁক পেয়েছে কি শোয়া চাই মাঘু

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি হবে? ছোটমা গাড়িতে উঠে আদুরে গলায় বললেন, আমার ঘুম আসে না।

কি করবে তাহলে?

চলো একটু ঘুরে যাই। হাওয়া খেতে খেতে। অনিলের মনে হলো ছোটমা তার একটা হাত দিয়ে ছোটবাবুর গলা পেঁচিয়ে ধরেছেন।

অনিল গাড়িতে স্টার্ট দিল। তার সব স্বপ্নের মতো লাগছিল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে ছোটমা ডাকলেন, অনিল, সোজা চালাও। একটু ঘুরে হাওয়া খেয়ে যাব। যাদবপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জ হয়ে··· ।

অনিলের বুক হঠাৎ ফেটে যাবার মতো হলো। সে কোনো কথা বলতে পারল না। কোনো প্রতিবাদ জানাল না। তার একবার মনে হয়েছিল সে এখুনি ছোটমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কাঁদে। পরক্ষণেই মনে হলো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সোজা গাড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোনো দূরে চলে যায়।

কতক্ষণ তার কোনো জ্ঞান ছিল না। সে কোথায়, গাড়ি ছুটছে কি দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারেনি সে। তারপর সে যেন ছোটমার আর্তনাদ শুনল। আর্তস্বরে ছোটমা যেন বললেন, গাড়ি এত জোরে ছুটছে কেন? ছোটবাবু তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিলেন। অনিল অবাক হয়ে দেখল গাড়ি উল্কার মতো ছুটছে। রাস্তার দুপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। একি! এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? কোথায়? তার মনে পড়ল যে একটা নীল হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিল। একটা স্তব্ধ পৃথিবী, নীল হ্রদ। অধিবাসীরা হ্রদের জলে কাঠের ঘরে বাস করে। ঘুমোয়, খায়, ঘুমোয়।

গাড়ি নয় যেন একটা ঝড় ছুটছে। হঠাৎ হঠাৎ ছিটকে আসা আলোকিত মোড়গুলো পলকের মধ্যে দূরে সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এলো অনিলের। তার নিজেরও ভয় করছিল। গাড়ির গতি কমাবার জন্যে সে ব্রেক খুঁজল। গাড়িতে কোথাও ব্রেক নেই। এক্‌সিলেটারের ওপর থেকে তার পা-টাকে সে সরাতে চাইল। পারল না। তার পা থামের মতো শক্ত হয়ে বসে গেছে। তার মনে হলো এই পা সরাবার কি গতি কমাবার সাধ্য তার নেই। কোনো নীল হ্রদের ধারে গিয়ে একদিন এই গাড়ি আপনি থেমে যাবে।

‘রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান এবং বাঁট’ প্রসঙ্গে

শৈলেন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কলকাতা তথা বাংলাদেশে নানাকারণে রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা আশানুরূপ বিস্তারলাভ করে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগের অভাব। সে সময় সাধারণভাবে সঙ্গীতশিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যে কটি ছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত ছিল না বললেই চলে। যে কজন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বা গায়ক ছিলেন তাঁরা সহজলভ্য ছিলেন না। এ হেন সময় ১৯৩৫।৩৬ সাল থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্র মারফত শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মরুভূমিতে বৃষ্টির মতো স্বাগত হয়েছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে সৃষ্টি হলো কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চাকারী শিল্পীগোষ্ঠী, যেমন, গীতবিতান, বৈতানিক, দক্ষিণী প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলির আগে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর তত্ত্বাবধানে গীতালি নামে একটি স্বল্পায়ু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন কলকাতার প্রায় অলিতেগলিতে সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং প্রায় সব ক-টিতেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

সকল ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রেও কিছু লোক সস্তায় নাম করার লোভে উপযুক্ত শিক্ষা বা চর্চা না করেই, কয়েকটি মাত্র গান সম্বল করে শিল্পী সেজে বসলেন। ফলে তাঁদের গায়নভঙ্গীর মধ্যে বহুক্ষেত্রেই বিকৃতি প্রকট হয়ে উঠল। তাঁরা অবশ্যই নিন্দার্হ।

আজ ১৯৬২ সালে—৫৮খণ্ড স্বরবিতানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধিকাংশের সুরের লিখিতরূপ স্বরলিপি প্রকাশ হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চাকারীদের সুরসংগ্রহের কোনো সমস্যাই নেই। কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংগ্রহ করতে চর্চাকারীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো আজ তা ঠিকমত বোঝানো সম্ভব নয়। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, গীতলিপি বহুদিন অপ্রাপ্য। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত স্বরলিপির বই গীতলেখা, বসন্ত, বৈতালিক, মায়ার

খেলা, কাব্যগীতি, গীতিবীথিকা, গীতপঞ্চাশিকা, কেতকী, বাল্মীকিপ্রতিভা, …গীতিকা, গীতমালিকা, পাঁচখণ্ড স্বরবিতান প্রভৃতি পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিঃশেষিত। কিছু স্বরলিপি ছড়িয়ে ছিল পুরাতন সাময়িক পত্রিকা যথা—বালক, বীণাবাদিনী, সঙ্গীত প্রকাশিকা, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রবাসী প্রভৃতির মধ্যে। প্রয়োজনের তাগিদে তৎকালীন চর্চাকারীরা বহু পরিশ্রম স্বীকার করে প্রয়োজনীয় স্বরলিপিগুলি সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৭ সাল থেকে বিশ্বভারতী বর্তমান পর্যায়ের স্বরবিতান গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রণ শুরু করলেন। এই সময় থেকেই প্রকৃত আগ্রহী চর্চাকারীদের এক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে—যার প্রতিকার সুদূর পরাহত।

নূতন সংস্করণ স্বরবিতানে সাময়িক পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে পূর্বপ্রকাশিত পুরাতন স্বরলিপির অনেকগুলি ভিন্নরূপে প্রকাশ করায় যে মতান্তরের সৃষ্টি হলো—তার জনক আশ্চর্যভাবে তাঁরাই—যাঁরা নিজেদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারক-বাহক বলে দাবি করেন। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমীদের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ শুরু হলো। সভায় আলোচিত প্রতিবাদ বিশ্বভারতী না শোনার ভান করে রইলেন। সরাসরি বিশ্বভারতীতে চিঠি পাঠিয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব পাওয়া গেল না। এরপর শুরু হলো পত্র পত্রিকায় লেখা—কিন্তু বিশ্বভারতী রহস্যজনক কারণে এ সমস্যার সমাধান করতে নারাজ।

১৩৮২ ভাদ্র সংখ্যার ‘সমকালীন’ পত্রিকায় শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর “রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্বরদলন’ প্রবন্ধে বললেন, “বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে স্বরলিপি প্রকাশিত তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাত যদি তাঁদের আত্মপ্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করত।··· রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এরা দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজি নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের

দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকে সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়াভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকেদের দ্বারা।"

এইরূপ সরাসরি অভিযোগে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয়ে পড়লেন কিন্তু সন্তোষজনক জবাবের অভাবে তাঁরা নীরব হয়ে রইলেন। পক্ষান্তরে সমালোচনাকারীদের বিভ্রান্ত করার প্রয়োজনে বিশ্বভারতীর কেউ কেউ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপন্ন' রব তুললেন। কেউ অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে প্রকারান্তরে সুরদলন সমর্থন করলেন। "দরদ দিয়ে ঢংটি বজায় রেখে গাইলে সারেগামা একটু ইতরবিশেষ হলেও হয়তো কিছু আসে যায় না" (রবীন্দ্রসঙ্গীত—গীতবিতান ১৩৬৮ বৈশাখ)। যুক্তিটি ঠিক বোধগম্য নয়। সুর হচ্ছে গানের মূল কাঠামো—মানবদেহে হাড়ের মতো। বক্তব্যটি উপমায় এইরকম দাঁড়ায় যে, 'হাড়ের গড়ন বিকৃত হলেও ক্ষতি নেই ত্বকের লাবণ্য বজায় থাকলেই হলো'।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি কলকাতার চর্চাকারীদের হাতে পড়ে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। তাকে আবার ঠিক রাস্তায় আনতে গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের খবরদারী দরকার। এজন্য আবার কেউ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন'-এর প্রস্তাব করলেন। বলা বাহুল্য এঁরা কেউই সৌম্যেন্দ্রনাথ বর্ণিত সুরদলনের ব্যাপারে অভিযোগমুক্ত নন।

দেশ পত্রিকায় শিক্ষক সম্মেলন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। ৫ই চৈত্র ১৩৬৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরদলনের বিস্তারিত উদাহরণ সহযোগে সঙ্গীতভবনের কর্তাদের বিভ্রান্তিকর মনোভাব এবং যথেচ্ছাচারের সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে, সুর সম্বন্ধে মতান্তরগুলি নিরসন করার দায়িত্ব বিশ্বভারতীর। সে বিষয়ে কোনো যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা অবধি শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব একান্তই অবান্তর। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমগ্র আলোচনাটি সংগ্রহ করে দেখে নেবেন। এই সময়ে শ্রীহীরেন চক্রবর্তী কতকগুলি অবান্তর যুক্তি দিয়ে শিক্ষক সম্মেলন তথা একটি দলগত মনোভাবকে সমর্থন করে সুরদলনের ব্যাপারটিকে 'স্বরলিপি বিভ্রাটের ফিরিস্তি' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চাকারী সেই অসার যুক্তির পিছনের মনোভাবকে চিনতে

[illegible] করেন নি। বলা বাহুল্য, শিক্ষক সম্মেলনের ধুয়ো তখনকার মত ঝিমিয়ে গেল।

যাঁরা নিজেদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের একমাত্র ধারক বলে মনে করেন, তাঁরা দেখলেন, যে, তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা সন্তোষজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাঁদের গোষ্ঠীভূত না হয়েও কেউ কেউ স্বদেশে তো বটেই বিদেশেও সম্মান অর্জন করছেন—এটা তাঁদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। তখন তাঁরা অন্যভাবে শান্তিনিকেতন-গোষ্ঠী বহির্ভূত শিল্পীদের তুচ্ছ প্রমাণে মন দিলেন।

২৩শে বৈশাখ ১৩৬৯ তারিখের যুগান্তর পত্রিকায় 'জনকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রবন্ধে উক্ত মনোভাবের প্রতিফলন দেখি। লেখক বলেছেন, "শান্তিনিকেতনে আজও তাঁর গানগুলির বিশুদ্ধ গীতরীতি বজায় রাখা হয়েছে। এখনও সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা কবির গানগুলি···শুদ্ধভাবে শেখে ও শুদ্ধভাবে গায়।" সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাইরে কি কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুদ্ধভাবে শেখা ও গাওয়া হচ্ছে না? যে প্রবন্ধে শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্য নিষ্ঠা সাধনা ইত্যাদির কথা বলা হলো সেখানে একই সঙ্গে—'অপরিণত শিশুকণ্ঠেও শ্রুত রবীন্দ্রনাথের গানের ছেঁড়া কলি হঠাৎ শুনলে মন রুদ্ধশ্বাসে উন্মুখ হয়ে থাকে। আকস্মিক গানের যাদু হরণ করে নিয়ে যায় মন থেকে সকল পার্থিব ভাবনা।"—বলার সার্থকতা বোঝা গেল না। প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকণ্ঠে যে কোনো সুরের কাকলীই মনকে আবিষ্ট করে—তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিশেষ পরিবেশ বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুপস্থিতি কোনো বাধার কারণ হয় না।

একই লেখক গীতবিতান পত্রিকা বৈশাখ ১৩৬৮ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঐতিহ্য' প্রবন্ধে বললেন, "শান্তিনিকেতনের গায়কী ও ঐতিহ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত রূপদান করে······রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান হচ্ছে সেই মান—যা শান্তি-নিকেতনের গায়কী ও ঐতিহ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।" আর একজায়গায় বললেন, "যে শিল্পী শান্তিনিকেতনে দীক্ষিত হন নি···সেই শিল্পীর প্রকৃত মান রক্ষা করা কষ্টকর।" তিনি আরো বললেন, "গুরুদেবের গান গুরুদেবের নিজস্ব ভঙ্গীতেই গাইতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের গান কি রকম ছিল তা আজ শুনে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। শেষ বয়সের কয়েকটি গান ও আবৃত্তি রেকর্ডে স্বরবদ্ধ করা

আছে। শান্তিনিকেতনের কোনো শিল্পীকেই ঠিক সে ধরনে গাইতে শোনা যায় না। গাওয়া নানা কারণে সম্ভবও নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কথায়, "গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে—অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে—যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে—গায়ক তো গ্রামোফোন নয়।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, "গুরুদেবের নিজকণ্ঠের গাওয়া রেকর্ডের গানগুলি আদর্শরূপে খাড়া করে এ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচার করতে গেলে দেখতে পাব যে গুরুদেবের পথে তাঁরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। কারণ গলার স্বরের হুবহু সমতা কখনো ঘটে না। তার প্রকাশের বেলায় গুরুদেবের গীতপদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করাও সম্ভব নয়।" (রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাতিবচার—রম্যবীণা ১ম সংখ্যা)

গীতকার রবীন্দ্রনাথকে গায়করূপে আদর্শ করে তাঁর গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করা আরো নানা কারণে উচিত নয়। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'The great masters I have heard' প্রবন্ধে বলেছেন, "He sang the famous song, 'Tumi Kamon kore gan koro re guni', which he composed on the spur of the moment. His voice was exquisite, its lack of depth most adequately compensated by its sweetness and range. He only faltered once, the major third of the higher octave. There were many defects in his voice, his sense of rhythm was not perfect, and he had not had much training, yet......" (১৯৫৫ সালে রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে)।

কলকাতায় বহু নিষ্ঠাবান শিল্পী আছেন যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চর্চা ও শিক্ষাদান করে থাকেন। যেহেতু তাঁরা শান্তিনিকেতনের নন অতএব তাঁরা অপাংক্তেয় এমন মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়।

সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত বলেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয় গায়কী পদ্ধতির দোষে। এ বিষয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী সেই শান্তিনিকেতনের গায়ক-গায়িকাদের সম্বন্ধে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। ...রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যদিও প্রশংসাযোগ্য, তথাপি এই প্রচেষ্টার আতিশয্যের ফলে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের

প্রাণবস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন, শুধু প্রাণহীন বাইরের কাঠামোটির উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের গায়কী অত্যন্ত নীরস মনে হয়।... আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহোৎসবে যোগ দিতে অগণিত সাধারণ ভিড় করে এসেছে। তাদের বিমুখ না করে সাদরে দ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয় কি?" (রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈচিত্র্য—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০)

হিমাংশুবাবুর বক্তব্যের জের টেনে বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার সম্বন্ধে আমাদের একটি বিষয়ে মনস্থির করা আশু প্রয়োজন। বিষয়টি এই যে গুরুদেবের সঙ্গীত প্রচার ব্যাপারে আমরা Quality চাই না Quantity চাই। বৈশিষ্ট্য, গায়নরীতি ইত্যাদি ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি থাকলে হয়তো Quality রক্ষা হয় কিন্তু তাতে ব্যাপ্তিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বলা বাহুল্য বহুল প্রচার ও ব্যাপ্তি আমাদের কাম্য হলে সেক্ষেত্রে সর্বস্তরে নিখুঁত রূপের অভিব্যক্তি আশা করা উচিত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের শুদ্ধরূপের জন্য হয়তো ব্যাকুল ছিলেন। আবার তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তি, "শহরে গ্রামে যখন যেখানে যাও আমার একটি গান কারো গলায় দিয়ে এসো," "বাঙ্গালীর শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবে"—থেকে জানতে পারা যায় তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গানের বহুল প্রচার হোক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচিত গানের সুর ও তানের (কিছুটা বিষয়বস্তুর) গুরুত্বের জন্য সহজ প্রসার সম্ভব নয়—এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে সহজ সুরে তালে গান রচনা করতে লাগলেন যাতে সহজেই লোকে সে গান শিখতে পারে। ফলে স্পষ্টতই রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি স্থূল ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। একটি ভাঙাগান (বিশেষত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভাঙা), অন্যটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মিশ্রসুর-ভঙ্গিমা ও সহজ কাব্যসঙ্গীত। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচকদের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর ওপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন·· এই জন্যই পুরাতনীরা রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচিত গানের অত ভক্ত" (কথা ও সুর)। "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে তিন চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে কিংবা স্তরে তিনি ভালো ভালো খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন।"

Arnold Bake বলেন, "Tagore stands at the meeting place

of three different influences: that of European music, that of classical Hindu music (an extremely sophisticated one bound by strict rules) and thirdly that of the popular religious music of Bengal...Later, however, Tagore's powerful personality asserted itself, and he threw off both the western influences of his childhood and youth, and that of Indian classical music."

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রথম প্রথম শুদ্ধ বা প্রাচীন রাগ-রাগিনীর মোহে তিনিও পড়েছিলেন এবং ফল ভালোই হয়েছিল। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর অনেক গানের সুরে আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সঙ্গীতের পূর্ণ অনুকরণ দেখতে পাই।" (ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ—গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০)

নারায়ণ চৌধুরী বলেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অগণন ব্রহ্মসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠরূপ ধ্রুপদের আদর্শ সজ্ঞানত গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কাঠামোর মধ্যে সহজিয়া আদর্শটিকে গ্রথিত এবং সঙ্গীতকে আত্যন্তিক মাত্রায় লোকপ্রিয় করতে গিয়ে ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ও কৌলিন্যের আদর্শ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিলেন।" (প্রসঙ্গকথা ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত—শনিবারের চিঠি, ১৩৬১ চৈত্র)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত, "প্রথমদিকের গান লিখেছেন আপন তাগিদে শেষের দিকে তাগিদ এসেছে বাইরে থেকে। শান্তিনিকেতনের জীবনের তথা বাঙালি জীবনের বহু দাবি গানের মাধ্যমে তাঁকে মেটাতে হয়েছে।" (রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামাজিক মূল্য—গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৬৮ বৈশাখ)।

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী ভাঙাগানগুলিকে 'অর্ধরবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন। তিনি বলেন, "মায়ার খেলাতেই রবিকা সত্যি রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠলেন।" বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত সবচেয়ে অরাবীন্দ্রিক যেমন সবটাই রাবীন্দ্রিক তাঁর ঋতুসঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগের গানগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিনীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাকবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও এ সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে। সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।" অন্যত্র তিনি বলছেন, "প্রথম

বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।"

ইদানীং অনেকের অন্ধভক্তি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের আদিতম গান থেকে শেষতম গান অবধি বিভিন্ন ধরনের নানান পর্যায়ের গানগুলির অনেকে কোনো প্রভেদ দেখতে পাচ্ছেন না। সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। তাঁদের মতে, "গাঠনিক বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বাউল, কীর্তন ইত্যাদির মধ্যে কোনো ভেদ নেই···পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তনের আস্বাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুর্লভ।" এই ভ্রান্তির জবাব পাওয়া যাবে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে।

অনেকে বলেন যে সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাকি এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য যে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেই সেটিকে নির্ভুলভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চিনতে পারা যাবে। শ্রীপ্রফুল্ল দাসের মতে, "রবীন্দ্ররচনায়, এমনকি তথাকথিত ভাঙাগানেও সর্বদা এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং থাকবার কথা যা তাকে প্রাচীন ও প্রচলিত সব গান থেকে বিশিষ্ট করেছে; যা সঙ্গীত সম্পর্কে বিচার-বুদ্ধিহীন অথচ Sensitive বালকেও বুঝতে পারে।" (রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ, পৃ ১৩০) এমন সঙ্কুচিত ও একদেশদর্শী মন্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ নয়।

যাঁরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা বা চর্চা না করেছেন, তাঁদের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ রচিত গানগুলিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় বলে চিনতে পারা খুবই কষ্টকর। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' ও 'আমি কোথায় পাব তারে' এ-দুটি গানের মধ্যে কোনটি রবীন্দ্রনাথের সেটা বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কারো নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার, রবীন্দ্রনাথের রচিত 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা,' 'ওহে জীবন বল্লভ', 'এরা পরকে আপন করে', 'আমায় ছ জনায় মিলে', হে দে গো নন্দরাণী', 'আজ আসবে শ্যাম' প্রভৃতি অজস্র গানকে তার গান নয় এমন ভুল করা খুবই স্বাভাবিক।

ঠিক এই কারণেই বহুদিন অন্যজনের কিছু রচনাকে খোদ বিশ্বভারতীর তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের বলে প্রচার করা হয়েছে, যেমন, 'বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে'। এমনকি ১৩৫৭ আশ্বিনে প্রকাশিত গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে 'প্রভু দয়াময়' গানটি রবীন্দ্রনাথের গান হিসেবে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য

শুদ্ধিপত্রে এটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বলে স্বীকার করা হয়েছে। স্বরবিতান অষ্টমখণ্ডে 'অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' পুস্তকে 'ডাকি তোমারে কাতরে' গানছটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে প্রচারিত হলে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকার জন্য এখনও গীতবিতানে সে দুটিকে স্থান দেওয়া হয়নি।

আবার রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা বহুদিন তাঁর রচনা বলে গৃহীত হয় নি, যেমন, 'এ হরি সুন্দর' 'গগনের থালে রবিচন্দ্র' ইত্যাদি (গীতবিতান—গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)।

অন্যের কথা থাক, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গান চিনতে পারতেন না। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "কবে কোন গান করেছি, কি সুর বসিয়েছি তাতে, তা কি আমার নিজেরই স্মরণ আছে? দিনু ছিল আমার সুরের ভাণ্ডারী—তার কাছ থেকে যে যতটা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়েছে। সবই যে অবিকৃত নেই, এত বুঝতেই পারো। হঠাৎ চলতি পথে কানে লাগে এক একটা রেশ; কান পেতে শুনি—নিজেরাই অচেনা লাগে যেন। পরিমাণের আধিক্যই এর কারণ হয়ত। কত মুকুল ঝরে যায়, কতগুলো ফলের মধ্যে মুক্তি পায়, আমগাছ কি খবর রাখে তার কোন কালে?"

Arnold Bake এই বিস্মৃতির একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন, "Tagore knows his memory to be poor and sometimes he even wishes to forget previous works so as to be free to create fresh ones; therefore when he had composed a new song he used to sing it to his nephew Dinendranath, thanks to whose excellent memory the song was saved from oblivion. Sometimes, the Poet had to learn his own songs afresh from Dinendranath. As he said with a smile to the writer 'I have to submit to this injury'."

যাই হোক, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নেই। ভাব, সুর, তাল সবদিক থেকেই সহজ হওয়ায় এগুলি শেখাও সহজ—পরিবেশন করতেও সচেতন সঙ্গীত-শিক্ষিত শিল্পীর ঐকান্তিক নিষ্ঠাই যথেষ্ট। বিশেষ কোনো ভঙ্গী দ্বারা আচ্ছন্ন না হলে যে রবীন্দ্রনাথকে সবিশেষ ভক্তি করা হবে না এমন মনোভাব অন্ধভক্তির পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ

একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভয় হয় পাছে ওর (হাসি বা উমা দেবী) নিজের গলার স্বাভাবিক দরদ কোনও শিক্ষিত ভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।"

বর্তমানে কোনো কোনো মহলে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীভাঙা গানগুলির পরিবেশন-পদ্ধতি সম্বন্ধে মতান্তর তুমুল হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো প্রখ্যাত গায়ক গায়িকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামোয় হস্তক্ষেপ না করে বিশেষ পরিমিতভাবে ধ্রুপদাঙ্গ গানে আলাপ ও দুন, খেয়ালভাঙা গানে তান ও টপ্পা বা ঠুংরী ধরনের গানগুলি তাল সহযোগে পরিবেশন করছেন। কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্ত এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন—এতে নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে। বিষয়টি নানাদিক থেকে বিচার্য।

সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের জাতীয় কবি। ইংলণ্ডের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি সেক্সপীয়র-চর্চা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। নাটকগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে তার মর্মোদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেন। এমন বহু বই পাওয়া যায় যাতে সেক্সপীয়রের কোনো নাটকের বিশেষ কোনো মুহূর্তটিকে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা বিভিন্ন সাজে ও ভঙ্গীতে অভিনয়ের ছবিগুলি একই সঙ্গে গ্রন্থিত হয়েছে—তুলনামূলক বিচারের জন্য। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেক্সপীয়রকে অসম্মান করা হয় এমন কথা কেউ বলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের গুরুমহাশয় চরিত্রটিকে 'হরবোলা' গোষ্ঠী ঈষৎ জড়বুদ্ধি নিষ্প্রভচক্ষু স্থবিররূপে রূপায়িত করেছিলেন। আবার শ্রীতরুণ রায়ের গোষ্ঠী সেটিকে চতুর চঞ্চল ও চাটুকার রূপে উপস্থাপিত করেন। যতদূর মনে পড়ে শ্রীরায় নিজে এই চরিত্রটির রূপদান করেন। উভয় রূপায়নই রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামোকে অবিকৃত রেখে ঈষৎ ভিন্ন পদ্ধতিতে ও মেজাজে পরিবেশন করেন তাহলে তাঁকে কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করা উচিত মনে হয় না এবং সে কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এ যুক্তিও অচল। যদি এই পরিবেশন-পদ্ধতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেই ধরা যায় তাহলে পদ্ধতিটি রসোত্তীর্ণ না হলে—সমজদার শিক্ষিত শ্রোতা সেটিকে গ্রহণ না করলে সেটি আপনা হতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য অকারণ উদ্বিগ্ন হয়ে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপন্ন' রব তোলা নিরর্থক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একাধিক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরসন্ধি বা harmonise করে প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী বলেন,

"আর একটি বিলেতী সুরবৈশিষ্ট্য, যাকে বলে হার্মনি বা স্বরসন্ধি, সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর বংশের কেউ কেউ এদিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন; কিন্তু বিশেষজ্ঞানের অভাবে সে চেষ্টা ছেলেখেলাতেই পর্যবসিত হয়েছে। তিনি তাদের এ খেলায় যোগ না দিলেও তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। যদি কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, কবি বর্তমান থাকলে সর্বাগ্রেই তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য দিতেন, এটুকু বলতে পারি।" (ত্রিবেণী সঙ্গম—পৃ ১০)

এই প্রচেষ্টার কয়েকটি সাক্ষর আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হলো—

গান	স্বরসন্ধি ও স্বরলিপিকার	পত্রিকার সংখ্যা
আমি চিনি গো	ইন্দিরা দেবী	ভাদ্র ১৩২১
বড় আশা করে	অশোকা দেবী	মাঘ ১৩২১
আজি শুভদিনে	প্রতিভা দেবী	চৈত্র ১৩২১

পরবর্তীকালে শ্রীমধু বসুর এ বিষয়ে পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি কবির 'দালিয়া' গল্পটির নাট্যরূপ ১৯৩৩ সালে কবির উপস্থিতিতে নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করার সময় 'গ্রামছাড়া ঐ', 'আমি চঞ্চল হে', 'আবার এসেছে আষাঢ়' গানগুলি হার্মনি সহকারে পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় শেষে শ্রীবসুকে বলেন, "গানগুলো তো বেশ শ্রুতিমধুর হয়েছে, মধু।" এতে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশন পদ্ধতিতে অখুশি হওয়া তো দূরের কথা—প্রসন্নই হয়েছিলেন।

হার্মনিকে দেশী ছাঁচে ঢেলে বাংলাগানে প্রয়োগকে তিনি 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে স্বাগত করেছেন। যিনি নিজের গানে একটি বিলাতি প্রয়োগ-রীতিকে সমর্থন করলেন তিনি তাঁর গানে দেশী আঙ্গিকের পরিমিত প্রয়োগকে বিরূপ চক্ষে দেখবেন এ কথা বলার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি সঙ্গীতের মুক্তির জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবেশন-রীতিটি সমর্থন করা চলে। বহু শিক্ষিত সঙ্গীতপ্রেমী আছেন যাঁরা উচ্চাঙ্গ-সুরভঙ্গিম-বাংলাগান শুনতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি বর্তমানে অধিকতর প্রচারিত হয়। সহজ সুর-তালের নিরাবরণ সঙ্গীতগুলি তাঁদের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে না। তাঁদের অধিকাংশের ধারণা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানই বুঝি এইরকম। ফলে, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের

গান সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩৬১ চৈত্র সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'প্রসঙ্গকথা॥ রবীন্দ্র-সঙ্গীত' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (যদিও প্রবন্ধটির সমস্ত মতামতগুলি বিতর্কাতীত নয়)। এই মহলে আলোচ্য রীতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের পরিধি বিস্তৃত করা যায় তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

বিভিন্ন সমালোচক রবীন্দ্রসঙ্গীতে আলাপ তান বাঁট সংযোগের বিপক্ষে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য জোরালো করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু খণ্ড বক্তব্যও তাঁরা উদ্ধৃত করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের উক্তি করেছেন। পরিণত বয়সে তিনি পূর্বের বহু মত পরিবর্তনও করেছেন।

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত ৬।২।১৯৩৮ তারিখের একটি চিঠিতে কবিগুরু বলছেন, "মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্য নূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্প প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহ-মাত্র নেই যে কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গীতের, সাহিত্যের কিম্বা কোনো ললিতকলার চরম গতি নয়।··· খাঁচার পাখীর মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবী করি, তা' হলে এই নকলনবিশী বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে।···মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই···শেষদিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি।"

রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো পূর্বতন বক্তব্যকে (যথা, সুর ও সঙ্গতি গ্রন্থান্তর্গত ১৯৩৫ সালে লেখা চিঠি) যেমন তাঁর গানে তানালাপ সংযোগের বিরুদ্ধ প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়, তেমনি ১৯৩৮ সালে লেখা উপরোক্ত চিঠি এবং নিম্নবর্ণিত কিছু কিছু খণ্ড বক্তব্য তানালাপের পক্ষেও হাজির করানো যেতে পারে।

"যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা

হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সংগম। যে গান গাওয়া হচ্ছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, সে যে তখনি-তখনি জীবন উৎস হতে তাজা উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল।"

"আলাপের উপাদানরূপে আছে বিশেষ রাগ-রাগিনী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এস্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য।"

"গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে।…গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।…যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

"বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে।"

উপরোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে একটি সত্য স্পষ্ট যে, প্রকৃষ্ট রূপ সৃষ্টির জন্য দরকার উপযুক্ত শিল্পীর। সেই সব শিল্পীই যথার্থ রসিক শিল্পী যাঁরা যথাসময়ে থামতে জানেন। কবি বলেন, "প্রত্যেক রসসৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে—ধ্রুপদে আছে, বাংলা গানে আছে, যদুভট্টের, গোঁসাই-এর গলায় ছিল।" "আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি।" এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ থাকবার কথা নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান বাঁটের প্রসঙ্গে অনাদিবাবু বলেন, "আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর প্রয়োজন দেখি না। তেমন শিক্ষা বা যোগ্যতাই বা কজনের আছে।" (গীতবিতান পত্রিকা—বৈশাখ ১৩৬৮) এখানেও সেই যোগ্যতার কথা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিমিত পরিমাণে তানালাপ ও সুর-

এর পক্ষে ছিলেন। ১৯৪৮ সালে জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনে অবস্থানের সময় এক ঘরোয়া আলোচনায় উক্ত মত প্রকাশ কালে বর্তমান লেখক, প্রসাদ সেন (বৈতানিক) প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তান বাঁটের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু ইন্দিরা দেবীর এই মত সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

তান বাঁট প্রয়োগের বিপক্ষে অনেকের লেখা নজরে পড়ে; কিন্তু কেউই বিশেষ কোনো শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেন নি। এই নরম সুর কোনো কোনো উগ্রপন্থীর পছন্দ হলো না। তাঁরা ভাবলেন রবীন্দ্রভক্তি প্রদর্শন ও সুরদলন সম্বন্ধে বিভ্রম সৃষ্টির পক্ষে এই পন্থা পর্যাপ্ত নয়। তখন তাঁরা অসৌজন্যের অশালীন তরবারী নিয়ে আসরে নেমে পড়লেন শিল্পী বিশেষের উদ্দেশ্যে।

এঁদেরই একজন শ্রীহীরেন চক্রবর্তী (এঁকে আমরা আগেও দেখেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে এঁর ব্যক্তিগত চর্চা বা অবদান সম্বন্ধে আমরা এখনও অন্ধকারে।) ১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পরিচয় পত্রিকায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং বাঁট' প্রবন্ধে অত্যন্ত অশিষ্টভাবে শ্রদ্ধেয় শিল্পীদ্বয় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে আক্রমণ করেছেন। এঁরা দুজনেই সঙ্গীতজগতে বিশিষ্ট শিল্পী। শুধু বাংলা দেশে নয়—সমগ্র ভারতে এবং বহির্বিশ্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে এঁদের বিশেষ অবদান আছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রাগপ্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে পরিবেশন করে গতানুগতিক একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় চালু একটি রীতির পুনঃ প্রচলন করলেন।

বহু ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীত ষৎ, আড়াঠেকা প্রভৃতি দুরূহ আয়াসসাধ্য তালে নিবদ্ধ। দেখা যায় বহু গায়ক গায়িকা উক্ত তালের গানগুলি তালহীন গান বলে বেমালুম বিনাতালে গেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'কখন দিলে পরায়ে অশ্রুভরা বেদনা', 'কোথা যে উধাও', 'বাজাও রে মোহন বাঁশী' প্রভৃতি যে কটি বিনা তালের গান আছে তার বহুগুণ গানকে বিনা তালের বলে চালিয়ে দেওয়া হয় শেফ শিল্পীর নিজের অক্ষমতা ঢাকবার প্রয়োজনে। একটি উদাহরণ দিই। 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানটি ৪।২ ছন্দ প্রয়োগের একমাত্র উদাহরণ। এটি প্রায়শ বিনা তালে গাওয়া হয়ে থাকে। এটি বিনা তালের হলে শান্তিদেববাবু প্রমুখ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞগণ এটিকে ৪।২ তালের বলে উল্লেখ করতেন না। শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের কাছে প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিকরা কৃতজ্ঞ যে তিনি দুরূহ তালের গানগুলিকে স্বকীয় রসে পরিবেশন করছেন।

শ্রীহীরেন চক্রবর্তী গুরুমহাশয় ভঙ্গীতে এই দুই বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদকে উপদেশ দিতে গিয়ে শুধু যে সঙ্গীত সম্বন্ধে 'অল্পবিত্তার' পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়—তাঁর নিজের দলীয় মনোভাবটি অপ্রকট রাখতে পারেন নি। অন্যথায় তিনি দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী বলে 'একজন' মাত্রের নাম বলতেন না—অন্তত অনাদি দস্তিদার ও শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করে সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতেন। তা ছাড়া, 'আনন্দধারা' গানটি শুদ্ধ মালকোষে গাওয়ার জন্য কেবলমাত্র রমেশবাবুকে অভিযুক্ত না করে একই সঙ্গে একই (তথাকথিত) অপরাধে অপরাধী শান্তিনিকেতনের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর নামও উল্লেখ করতেন। বর্তমান পর্যায়ের স্বরবিতানের স্বরলিপি যদি একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে তিনি শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের কণ্ঠে 'বাজাও আমারে বাজাও' গান শুদ্ধ মালকোষে বা 'মরের সাগর পাড়ি দেব' গানটি দাদরা তালে বা 'বাজে করুণ সুরে' গানটির 'দূরে' কথাটির সুর সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন করলেন না—"এই সুরটা এল কোথা থেকে ?"

এই সূত্রে বলা যায় 'রবীন্দ্রনাথ' জীবনীচিত্রে শ্রীসত্যজিৎ রায় 'কালি কালি বলো রে আজ' গানটির বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত স্বরলিপি অনুযায়ী সুর গ্রহণ না করে পুরনো সুরেই গাইয়েছেন।

তান বাঁট প্রয়োগের অসমর্থন করতে গিয়ে শ্রীচক্রবর্তী বহু অসংলগ্ন ও অবান্তর যুক্তি ও বক্তব্যের অকারণ অবতারণা করেছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি খণ্ডনের প্রয়োজন দেখি না, স্থানাভাবও বটে। এগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করা যেত যদি না এগুলি ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে প্রযুক্ত হত। সঙ্গীত সমালোচক হীরেন চক্রবর্তী মহাশয়ের সাঙ্গীতিক জ্ঞানের গভীরতা দেখাবার জন্য দুয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধ্রুপদ সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, "আলাপই হলো ধ্রুপদের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ…আলাপের পরে ধ্রুপদের আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না, চারতুকের কাব্যাংশটি হলো একপ্রকারের কনসোলেশন প্রাইজ যার অভিপ্রেত প্রাপক হলেন স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী" (পৃ ১২১০)। ধ্রুপদের কোনো ঘরানায় আলাপ আছে কোনো ঘরানায় নেই। বিষ্ণুপুরের ঘরানায় আলাপ প্রচলিত আছে। আলাবন্দে খাঁ, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় এঁরা আলাপিয়া ঘর। আবার মেহেদী হোসেন, গোপালবাবু, অঘোরবাবু, বিশ্বনাথ রাও, কাশীনাথ শুক্ল, আলিবক্স খাঁ, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য—এঁদের ধ্রুপদ আলাপ

বর্জিত। শ্রীচক্রবর্তী কি এঁদের ধ্রুপদী বলে স্বীকার করেন না? এঁরা কি সারাজীবন কেবলমাত্র অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জন করেই ভারতজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন ?

শ্রীচক্রবর্তী একজায়গায় বলছেন (পৃ ১২১৪), "সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরে রবীন্দ্রনাথ আর দুই তুকের গান রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না"—এটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে স্তুতি না ব্যাজস্তুতি বোঝা গেল না। এই আজব ফরমুলা অনুযায়ী বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সাঙ্গীতিক সাবালকত্ব অর্জন করেন নি। কারণ ১৯৪১ সালে রচিত গান 'ঐ মহামানব আসে' প্রকৃত পক্ষে দুই তুকের গান। আর, চারতুকি নয় এরকম গান তিনি শেষ দশ বৎসরেও প্রচুর রচনা করেছেন।

বাংলা গীতি কবিতায় চারতুকি রচনাপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের আগেও আমরা প্রচুর দেখেছি। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার প্রবাহে রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতির উত্তরসূরী বলা চলে—বাংলা গানে তিনি এর প্রবর্তক নন। কয়েকজন রচয়িতার নাম রচনাসহ উদ্ধৃত করা হল—

রামমোহন রায়	—	মনে কর শেষের সে দিন
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	—	এতদিনে পোহাইল
যদুভট্ট	—	বিপদভয় বারণ
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	জাগো সকল অমৃতের
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	থেকো না থেকো না দূরে
জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	—	তুমি হে ভরসা মম
হেমেন্দ্রনাথ	—	নাথ তুমি ব্রহ্ম
গজেন্দ্রনাথ	—	গাও হে তাঁহারি নাম
সৌদামিনী দেবী	—	প্রভু পূজিব তোমারে

শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, "ঠুংরীর ক্ষেত্রে 'ভাও বাৎলানো'—নির্দিষ্ট রীতির অপরিহার্য অঙ্গ।" বক্তব্যটি যথার্থ নয়। কেন না 'ভাও বাৎলানো' ব্যাপারটি audio-visual, কেবলমাত্র শ্রবণের ব্যাপার নয়। পূর্বে বাইজীরা গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করে একই পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। কোনো কোনো ঘরানার নৃত্যশিল্পী এই 'ভাও বাৎলানো' প্রদর্শন করে থাকেন। বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী শম্ভু মহারাজের ভাও বাৎলানো বর্তমান লেখকের 'আকারের' কোনো বৈঠকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র কণ্ঠে

ভাও বাংলানো মোটেই সম্ভব নয়। এটির ঠুংরী চালের অপরিহার্য অঙ্গ কী করে বলা যায় তা বোধগম্য নয়।

হীরেনবাবু "বাংলাগানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্র সঙ্গীতের পক্ষপাতী, শুদ্ধ সঙ্গীতের নয়" (পৃ ১২১২)—এ কথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। মিশ্র সঙ্গীত বা শুদ্ধ সঙ্গীত বলতে তিনি কী মনে করেন? শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলতে কি তিনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর কথা বলেছেন? আজ আমরা অসংখ্য রাগ-রাগিণী সমন্বিত রাগসঙ্গীতের যে রূপ দেখছি তা বহু মিশ্রণ, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। সঙ্গীতের কাব্যরূপে বহুক্ষেত্রে রাগের ধ্যানরূপ বজায় থাকে নি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ভৈঁরোর ধ্যান রূপ—

গঙ্গাধর শশিকলা তিলক্সি নেত্রঃ
সর্পৈ বিভূষিত তনু গজকৃত্তিবাসা
ভাস্ব ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ড ধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি আদি রাগঃ

এই রাগেই রচিত গান, 'প্যালা মুঝে ভর দেরে' সম্পূর্ণ ভিন্নরস বহন করে। এই মিশ্রণ কার্যে বা রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ যুগ যুগান্তের পতাকাটি নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটিতে ইমনকল্যাণে (ইমন নয়—শ্রীচক্রবর্তী সম্ভবত শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগ লক্ষ্য করেন নি) কোমল-ঋষভ প্রয়োগ তারই উত্তরসাধনা। তিনি বহুক্ষেত্রে বেহাগ সুরে কোমল নিষাদ প্রয়োগ করেছেন—সেটি যে বেহাগড়া রাগের প্রভাব নয় এটি স্থির প্রত্যয়ে বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুদ্ধরাগের ব্যবহার যেমন দেখা যায়—মিশ্রণের প্রচুর উদাহরণও আছে। দুটির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করাই শ্রেয়। তাঁর মিশ্রণের উদাহরণ দেখিয়ে শুদ্ধ রাগপন্থীদের প্রতি তাল ঠোকা সুস্থ মনোভাবের পরিচয় নয়। আজকের তথাকথিত শুদ্ধরাগ (যেমন মিঁয়াকী তোড়ি, হোসেনী মল্লার প্রভৃতি) বিগত দিনের অশুদ্ধরাগ। আকবরের সময়ে ধ্রুপদকে শাস্ত্রীয় বলে গণ্য করা হত না—এর প্রমাণ আছে।

একমাত্রায় একাধিক স্বরবিন্যাস হলেই সর্বক্ষেত্রে সেটিকে তান বলা চলে না। 'হায় গৃহহারা'র যে সুরাংশটিকে শ্রীচক্রবর্তী 'বোলতান' বলে আখ্যা দিয়েছেন, সেটি বোলতান তো নয়ই—যথার্থ তানও নয়, এটি গানের বন্দেজ।

শ্রীচক্রবর্তী সুযোগ করে ইমন সুরে 'হে গণরাজ মহারাজ' গানটি শুনলে দেখতে পাবেন যে, 'হে' অক্ষরটির উপর ৭ মাত্রায় সরা গন্ধা পধা নর্সা নধা পন্ধা গরা এই স্বর বিন্যাসটি আছে। যে কোনো রাগসঙ্গীত বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে ওটিকে তান বলা হয় না—ওটি গানের বন্দেজ।

একটি ব্যাপার আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করেছে। যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্বজী সেজে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদদের উপদেশামৃত বিতরণ করতে দ্বিধা করেন নি—তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মোটামুটি সংখ্যাও জানেন না। শ্রীচক্রবর্তী (১২২৯ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, তিনি নাকি "তিন হাজার গানের স্বরলিপি" দেখেছেন। যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন তাঁরা কিন্তু ৫৮ খণ্ড স্বরবিতানে (২।৩ লাইন গানের স্বরলিপি সমেত) অনধিক ১৮৭০টি এবং ইতস্তত পত্রিকাদিতে ছড়িয়ে থাকা স্বরলিপি ধরে মোটামুটি ১৯০০-র বেশি স্বরলিপির সন্ধান পান নি। শ্রীচক্রবর্তী বাকি ১১০০ অপ্রলব্ধ স্বরলিপির সন্ধান তাঁদের জানালে তাঁরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। গীতবিতানে এ পর্যন্ত অনধিক ২১৭০টি গান এ যাবত সঙ্কলিত হয়েছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গানগুলি ধরে মোট সংখ্যা মোটামুটি ২৩০০ ধরা যেতে পারে। বাকি ৭০০ গান সম্পর্কেও একই কথা। এমন কি, গানগুলিকে কে বা কারা স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা পরিষ্কার নয়। তিনি (১২১৯ পৃঃ) বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ···প্রত্যেকটি গানের সুর স্বরলিপির বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন।" বর্তমান সংস্করণ স্বরবিতানে বহু ৬ মাত্রা ৮ মাত্রার গান পূর্বে ১২ মাত্রা ১৬ মাত্রায় ভাগ করা ছিল। ১৩৪৩ সালে মুদ্রিত নবগীতিকা দ্বিতীয় খণ্ডে (তখন এগুলি স্বরবিতান ভুক্ত হয় নি) 'প্রখর তপন তাপে' গানটি তিনি ১২ মাত্রার ভাগে দেখতে পাবেন। এটিকে ত্রিমাত্রিক একতাল বলাই সঙ্গত। সম্ভবত এ তথ্য শ্রীচক্রবর্তীর জানা নেই। তিনি 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি শুনে অবাক হয়েছেন—এর গায়ন ভঙ্গিমা দেখে। বর্তমান ৪০শ খণ্ড স্বরবিতানে প্রকাশিত উক্ত গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির সঙ্গে ১৩২১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা আনন্দসঙ্গীত পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী কৃত স্বরলিপিটির সুরে তালে মিল নেই জানলে নিশ্চয় আরো অবাক হতেন।

সম্প্রতি মুদ্রিত স্বরবিতান সম্বল করেই তিনি বিতর্কে নেমেছেন এবং স্বরলিপি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাঁর জানা নেই এটি তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট। অন্যথায় তিনি বহু বিতর্কিত 'আনন্দধারা' গানটির সুর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতেন

না। তিনি বলেছেন, "গানটির রাগ পরিচয় মিশ্র মালকোশ। রমেশবাবু যে গান গেয়েছিলেন তার সুর মালকোশ।···এই সুরটা এল কোথা থেকে? এ কার রচনা?" যদি তাঁকে প্রতিপ্রশ্ন করা যায় যে, ১৩০৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যার বীণাবাদিনী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপিটির কী গতি হলো—তা হলে তিনি কি কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবেন? স্বরলিপি চিহ্নদৃষ্টে সেটিকে সহজেই বীণাবাদিনী সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে চেনা যায়। সেটিতে কোমল ঋষভ, কড়িমধ্যম ছাড়াও একাধিকবার পঞ্চমের ব্যবহার আছে বটে—কিন্তু এর রাগ পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'মালকোষ'। আবার ৩৩।৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের টিপ্পনীতে বলা হয়েছে যে, "যে সকল গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই মূল হিন্দুস্থানী গান হইতে ভাঙা···দ্বিতীয় গানটি (আনন্দধারা) মালকোষ রাগের। ইহা অতি গম্ভীর রাগ—যেমন খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদে অধিক প্রশস্ত···কোনো কোনো গানে কোমল রিখাবও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কখন কখন অলঙ্কারের হিসাবে একটু আধটু কড়িমধ্যমও লাগে।"

গানটি মিশ্র সুরের হলে তিনি এভাবে উল্লেখ করতেন না। কারণ, 'কী রাগিনী' গানটি প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন, "এই গানের সুরটি মিশ্র ধরণের। ইহাতে কানেড়া, সিন্ধু, পিলু প্রভৃতির অংশ আছে। এই সুরটি রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত।" (বীণাবাদিনী ১৩০৪ পৃঃ ৫৪)। শেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানে শুদ্ধ রাগের সুরপ্রয়োগকে তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত বলে মনে করতেন না। 'সম্পাদকের টিপ্পনী' থেকে মনে হয় যে সেই সময় কোনো কোনো ঘরাণায় শুদ্ধ মালকোষ রাগে মূর্ছনা হিসাবে কোমল রিখব ও কড়িমধ্যমের প্রয়োগ হত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপিটিতে নানা কারণে কিছুটা বৈষম্য দেখা দিলেও স্বরলিপিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এটিকে শুদ্ধ মালকোষই বলতে চেয়েছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকেই গানটি অনেকে শুদ্ধ মালকোষে গেয়ে আসছেন। সম্প্রতি লোকান্তরিত শান্তিনিকেতনের আদি ছাত্র সুধীরকুমার নাথ মহাশয়ের নিকট এই সুরের সমর্থন পেয়েছি।

শ্রীচক্রবর্তী কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বীণাবাদিনী পত্রিকাটি দেখে নিতে পারেন। বইটির সংখ্যা 182 QC 894.4-5। বিশ্বভারতী স্বরলিপি প্রকাশন বিভাগে বইটি আমি পূর্বে দেখেছি। কিন্তু শ্রীচক্রবর্তীকে সেখানে যেতে

বলি না এই কারণে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের যথেচ্চাচার (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অক্ষমতা)-এর প্রমাণ লোপ করার জন্য, বইটি নাকি বর্তমানে নেই, এই অজুহাতে কাউকে দেখতে দিচ্ছেন না। আরো একটি কারণ—স্বরলিপি প্রকাশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীপ্রফুল্ল দাসের 'আনন্দধারা' গানে মালকোষ রাগে কোমল ঋষভ ও কড়িমধ্যম প্রয়োগ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাটি মাঠে মারা যায়।

সুর সম্বন্ধে মতান্তরের কথা বাদ দিলে শ্রীচক্রবর্তীর লেখা থেকেই প্রকাশ যে, রমেশবাবু মূল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ক্ষুণ্ণ না করে তার যথাযথ রূপটি বহাল রেখে তান প্রয়োগ করেছেন। শ্রীচক্রবর্তী 'হলক তান' সম্বন্ধে যথার্থ ওয়াকিবহাল নন কারণ বাংলা গানে মোটেই হলকতান লাগে না। খেয়ালেও বর্তমানে হলকতানের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। বর্তমান লেখক কোনো দিনই রমেশবাবুকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'হলকতান' লাগাতে শোনেন নি।

শ্রীচক্রবর্তীর রমেশবাবুর পরিবেশন পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে ভালো না লাগতে পারে, সে সম্বন্ধে কারো কিছু বলবার নেই; কিন্তু সমালোচনার ভান করে তিনি যে ভাবে বিদ্বেষের বিষ উদ্‌গীরণ করেছেন সেটি অত্যন্ত আপত্তিজনক। রমেশবাবুকে নিন্দা করা—চাঁদে থুতু দেওয়ার সামিল। তাঁর প্রকৃত মূল্য দেশবাসী জানেন বলেই বারে বারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত তাঁকে সম্বর্ধনা করেছেন। সেদিন ১৮।৮।৬২ তারিখেও কংগ্রেসের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে তাঁকে সম্মানপ্রদর্শন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনে রমেশচন্দ্র কবির সামনে তাঁরই গান গেয়ে প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। কবি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, "Sreeman Banerjee is moreover fortunate in having a voice, which is at once sweet and expressive. I hope his talent will meet with proper recognition." বলা বাহুল্য কবির আশা বিফল হয় নি।

তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও শ্রীচক্রবর্তীর সমালোচনা তর্কের অপেক্ষা রাখে। শ্রীচক্রবর্তী রাধিকাবাবুর সুরের প্রভাব কয়েকজনের কণ্ঠে খুঁজে পাননি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ, স্বকীয় শিল্পকুশলতার অধিকারী হওয়া সহজ ছিল না। রাধিকাবাবুর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিকে সমগ্র রসিকজন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলেই উপভোগ করেছেন। কতযুগ পরে জনৈক হীরেন চক্রবর্তী মহাশয় সেগুলিকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে স্বীকার করতে যদি কুণ্ঠা বোধ করে

থাকেন—সেটি একান্তভাবে তাঁরই মত। গোঁসাইজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উচ্চধারণার সাক্ষর আছে 'স্বর ও সঙ্গতি' পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায়।

প্রকাশিত স্বরলিপিতে গোঁসাইজি প্রযুক্ত তানের স্বরলিপি না থাকায় হীরনবাবু সেটিকে নঙর্থক সমর্থনের প্রমাণ মনে করে উল্লসিত হয়েছেন। তাঁর মতো সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্ভবত ভুলে গেছেন যে আলাপ বা তানের কোনো গ্রন্থিত স্বরলিপি স্থায়ী অন্তরা ইত্যাদির স্বরলিপির সঙ্গে কোনো সময়েই দেওয়া থাকে না। সেটি শিল্পীর দক্ষতা মেজাজ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বহু প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগেও রবীন্দ্রনাথের রাগপ্রধান ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বহুল ক্ষেত্রে বৈঠকী রীতিতে পরিবেশন করা হত। কালাতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়নরীতি ক্রমশ বদলে বদলে আজকের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে—এই সত্যটিকে শ্রীচক্রবর্তী এবং আরো অনেকের মেনে নিতে কেন বাধছে। রাধিকাবাবুর সমসাময়িক কোনো শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের (রেকর্ড) গায়নভঙ্গী আজ ১৯৬২ সালের পরিবেশন-রীতির সঙ্গে হুবহু মেলে কি?

শ্রীচক্রবর্তী একটি অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন, "গান শোনানোর পর রবীন্দ্রনাথ যদি রাধিকাবাবু অথবা গোপেশ্বরবাবুদের তারিফ করে থাকেন তবে সেটি সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই গ্রহণীয়, অনুমোদনের লক্ষণ হিসেবে নয়। আর রাধিকাবাবুর গানের প্রশংসা করেছেন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গান হিসেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে নয়।"

আর যেই হোক অন্তত রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে বা চালাতে চাননি। যে রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্পর্কে গান্ধিজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি—যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতী বস্ত্র বয়কট করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নি—যাঁর ইংরাজ অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধিত্যাগ ইতিহাসের ঘটনা—যিনি লিখেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তবে ক্রোধ তারে যেন তৃণ সম দহে"—তাঁর সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তি কতটা শ্রদ্ধা বহন করে সেটা সুধীজনের বিচার্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে যদি ইন্দিরা দেবীর থেকে বেশি করে দেখতে যাই, তাহলে নিজেদের 'মার চেয়ে বেশী দরদ' যার তাকে যা বলা হয়—তাই প্রমাণ করা হবে। তান আলাপ দুন করা সম্পর্কে তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। "যাকে আমি 'অর্ধরবীন্দ্রসঙ্গীত' বলি সেই টপ্পাভাঙা

গানে বরাবর মূল হিন্দীগান অনুযায়ী তান দেওয়া হয়ে আসছে সকলেই জানে ও মানে। এমন কি যাঁর-গলায়-কুলোয় তিনি নতুন নতুন অজস্র তানে গান অলঙ্কৃত করেছেন, যথা, 'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে'তে রাধিকা গোঁসাইজী। ধ্রুপদে বাঁট চলবে না তবে দুন চৌদুনও এখনই আরম্ভ হয়েছে তাতে দোষ নেই। আমার মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান দেবার সময়ে দুটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে।

(১) ধর্মসঙ্গীতে অতিরিক্ত তানে যেন ভক্তিভাবকে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়।

(২) কবির কথাই গানের প্রাণ, সেগুলি যেন কোন রকমে বিকৃত না করা হয়।

মোটকথা খুব সাবধানে সন্তর্পণে এগোতে হবে, যাতে অপব্যবহার না হয়। সইয়ে সইয়ে নতুন অলঙ্কার দেবার চেষ্টার আমিও পক্ষপাতী।" (মূল পত্রের সন্ধান বর্তমান প্রবন্ধলেখকের কাছে পাওয়া যাবে)

তাছাড়া তাঁর গানে তান প্রয়োগের যৌক্তিকতার চরম উদাহরণ হিসেবে, রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি তুলে দেওয়া হল, "আমি তো কখন একথা বলিনি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলাগান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলঙ্কারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।"

আমি লেখার মধ্যে মোটাহরফ বা আণ্ডারলাইনের পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি এড়িয়ে যাবে না।

পরিমিত মাত্রায় তান আলাপ প্রভৃতি প্রয়োগের জন্য রমেশবাবুর পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'রমেশী সঙ্গীত' বলে ব্যঙ্গ করতে হীরেনবাবুর সৌজন্যে বাধে নি। কিন্তু তথাকথিত জাতীয় সংহতির নামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ভাষাটিকে (যেটি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব) পাল্টে অন্য ভাষায় তথাকথিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' পরিবেশন সম্পর্কে তিনি নীরব কেন? স্বনামে প্রতিবাদ করলে 'জাতীয় সংহতির শত্রু' বলে অভিহিত হবার ভয়ে নাকি?

যে কোন বিষয়ে যে কোনো লোকের সমালোচনা করার অধিকার আছে। এটি সবক্ষেত্রেই স্বীকৃত সত্য যে আলোচ্য বিষয় সমালোচকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকা চাই, অন্যথায় সমালোচনা ছেলেখেলায় পর্যবসিত হয়। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সত্যই দুর্দিন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুঁটিনাটি ও সাধারণভাবে সঙ্গীতের টেকনিক্যাল বিষয় না জেনেই কিছুলোক রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুভানুধ্যায়ী সেজে সত্যকারের কৃতী শিল্পীর অবমাননা করতে শুরু করেছেন।

যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

অরুণা হালদার

বারোই জানুয়ারি সকাল সাতটা নাগাদ বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে মনে হলো—গতকাল এমন সময়ে আমরা দিল্লীর এয়ারপোর্টে এসে গিয়েছি। আজ মস্কোতে আমার প্রথম দিন। আকাশ কুয়াশার মতো আবরণে ঢাকা। অল্প একটুখানি আলোর মধ্যে দিনের আভাস পেলাম। ভারতবর্ষের সময় অনুসারে এখানকার সময় আড়াই ঘণ্টা পিছনে, অর্থাৎ এখন তবে ভারতবর্ষে বেলা সাড়ে নয়টা হয়ে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে সামনের দৃশ্যপট দেখতে লাগলাম। দিকটা ঠিক করতে কষ্ট হলো না। কুয়াশা সত্ত্বেও পূর্ব দিক অরুণাভ। এই হোটেলের জানলা বড় রাস্তার উপর। সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে আলোকপাত হচ্ছিল। এই আলো যে-দেশ আরও আড়াই ঘণ্টা আগে ছুঁয়ে এসেছে তারও উপর তো এই আদিগন্ত আকাশের প্রসার রয়েছে। অকস্মাৎ আকাশটাকেই মনে হলো অত্যন্ত আপনার।

ইতিমধ্যে মস্কো নগরীর চলাফেরা অফিসের গতায়াতও শুরু হয়ে যাচ্ছে। দোকান এক-আধটি খুলেছে বা খুলছে। শুভ্রকান্তি ঋজু দেহ নরনারীর চলাচল বাড়ছে, বাস থেকে ওঠানামা দেখে মনে হচ্ছিল কলকাতার অফিস-যাত্রার আয়োজন। আনন্দের সঙ্গে দেখছিলাম এখানে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও তার সঙ্গে শক্তির সমন্বয়। আমাদের দেশে কোথায় বা খাদ্য আর কোথায় বা প্রাণ। তবুও মন বলে—শক্তির অভাব আমাদের দেশেও নেই। কারণ, এত বিপর্যয়ে, দারিদ্র্যে, রোগেও যে প্রাণশক্তি নিজেকে টিকিয়ে রাখে, আর 'কালচারের' নামে মেতে ওঠে, তাকে শক্তিহীন অন্তত বলা চলে না। সে জাতি শক্তির ওভারড্রাফ্‌ট্ কেটেই চলেছে প্রতিকূলতার ধার শোধ করতে।

বিধাতা আমায় দেননি অনেক কিছুই। যা তিনি দিয়েছেন বোধ হয় তার কয়েকটি ক্ষতিপূরণের জন্য না দিয়ে পারেন নি। তার মধ্যে একটা হলো ভাবনা-চিন্তা অকারণ না করা। মূর্খমাত্রেরই ঐ প্রবৃত্তি আছে। রাজ্যের

ভাবনা মাথায় আসবার আগেই আমারও তাই মনে পড়ল আটটার সময় শ্রীমতী এইক্‌গেকিয়া বীকভা এসে আমাকে নিচের খাবারঘরে নিয়ে যাবেন। আমার ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মর্ম এখানে কেউ বুঝবে না; সুতরাং ভাষাহীন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আর মানুষ সে যতোই সহানুভূতিশীল হোক নির্বাক লক্ষণে কেউ অভ্যস্ত নয়। বীকভা বা অন্য কেউ দোভাষাণী না হলে প্রাতরাশেও নিরাশ হয়ে থাকতে হবে। শুধু কি তাই? নিচের খাবার-ঘরে যাওয়াও তো আমার পক্ষে শক্ত। গতরাত্রে যে কোথা দিয়ে কেমন করে এ ঘরে এসেছিলাম তা আমার কিছু মনে নেই। এমনিই আমার space perception ভীষণ কম। 'দিগ্‌বোধ'-এর এবম্বিধ অভাবের জন্য বাড়িতে ওঁর কাছে কম বকুনি খাইনি। কিন্তু সে বকুনিতে এমন ফল হয়নি যে এই গোলকধাঁধায় রাস্তা বার করব। আর ভাষা না বলতে পারলে তো জেনে পুঁছে নিতে ওঁরাও পারতেন না। অথচ কাল রাতে এক পেয়ালা কফি শুধু খেয়েছিলাম—মনটা ভোর থেকেই চায়ের চাতক হয়ে আছে। আটটার পূর্বে তা মিলবে না। বৃথা ভাবনা না করে বাইরে যাবার পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম। তাও তো এতদ্দেশে সামান্য পর্ব নয়। আটটা পনেরো মিনিটে শ্রীযুক্তা বীকভা এসে গেলেন। শুনেছি তাঁর বাড়ি মস্কো শহরের তুলনায় এ পাড়ার কাছাকাছি। হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় হলো। তারপর তাঁর সঙ্গে নিচেকার রেস্তোরাঁতে গেলাম। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, আমার আসার পর দুটি তার করে দেওয়া হয়েছে। একটি দিল্লীতে আমার স্বামীকে; অন্যটি কলকাতায় আমার ভাইকে। তাই তাঁরা আমার মস্কো পৌঁছানোর খবর ঘণ্টা চারেক পূর্বেই পেয়ে গিয়েছেন।

প্রাতরাশ খাবার জন্য আমরা ছোট রেস্তোরাঁতে এলাম। বীকভা জানেন আমি সম্পূর্ণ শাকাহারী প্রাণী। দেশে থাকতেও মাছ-মাংস আমি নিয়মিত খাই না। তবে কখনও সখনও খাই। দীর্ঘকাল নিরামিষ খাদ্যই আমার অভ্যাস ছিল। এখানে আমার খাদ্য নির্বাচন করা একটু কঠিন। এদেশে তাঁর নিরামিষ, আমারও তা গ্রাহ্য। আর একটা জিনিস নতুন খেলাম লেমন-চা ও রুটি-চীজের সঙ্গে, তা হলো 'কেফির' বা টক্ দুধ। অনেকটা ঘোলের মতো খেতে। খাবারঘরেই যাই বা যেখানেই যাই লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি অপ্রকট থাকে না। কৌতূহলটা অবশ্য আমার শাড়ি নিয়ে। ব্যবহার্য নিয়েও হয়তো তারা কৌতুক বোধ করত, কিন্তু ব্যবহার্যটা আরও স্পষ্ট

কৌতুহলোদ্দীপক। পরেও দেখেছি শাড়ি দেখলে এদেশের লোকের মুখ-চোখ বিস্ময়ে কেমনতরো হয়ে যায়। সে বিস্ময় অকপট, শিশুর অবাক হবার মতোই অকৃত্রিম। শুনেছি অন্য অনেক দেশেও শাড়ি সমাদৃতা। কোনো রকমে নিরামিষ খাদ্যে প্রাতরাশ সেরে দু'জনায় ঘরে এলাম। আমি প্রতীক্ষা করছিলাম শ্রীযুক্তা তীমফিয়েফের কাছ থেকে টেলিফোন পাব বলে। তাতে করে জানতে পারব যে, আমাকে কবে বা কখন লেনিনগ্রাদ যেতে হবে। কথা ছিল তিনি আমার যাত্রার ব্যবস্থা (বুক) করে খবর দেবেন। বীকভা কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। তিনিও প্রতীক্ষমাণা, কারণ, উপস্থিত তিনিই আমার দোভাষী। কিছুক্ষণ বাদে জানা গেল যে পরদিন (১৩ তারিখে) সকাল সাড়ে দশটা বা এগারোটাতে যে প্লেন ছাড়বে তাতেই আমার লেনিনগ্রাদ যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখন তা হলে বীকভা যান কাজে—আমি থাকি ঘরে। একা আর কি করি? জানলা দিয়ে শহর দেখতে লাগলাম। আর বীকভাও ছুটোর সময় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন; তারজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বুদ্ধি করে হোটেলের এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হোটেলের চারদিকেই বড় বড় সড়ক—অনেকদূর খোলা। সামনের দিকে বাইরে তো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—একটা স্কোয়ার বা চত্বর, তার শেষে মস্কো নদী। কিন্তু বেশি ঘুরে দেখবার মতো বুদ্ধি থাকলেও দিগ্‌বোধ আমার নেই।

দ্বিপ্রহরের পরেই এখানকার লোকে আবার ভোজনে রত হয়। সেটা 'লাঞ্চ' নয়। কারণ, এই সময়কার খাওয়াটাকেই 'ডিনার' বা বড় খানা বলা চলে। দ্বিপ্রহরের সেই খানার সময়ে বীকভা এসে আমাকে আবার নিচেকার বড় ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। শাড়ির ওপর 'দৃষ্টি' দেওয়া সইতে সইতে একটি টেব্‌ল অধিকার করে বসলাম। কিছুদূরে অন্য এক টেব্‌লে বসেছিলেন একটি আফ্রিকেয় যুবা ও তার বান্ধবী। তৃতীয় টেব্‌লে একটি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে আমার ভারতীয় বলেই মনে হলো। সম্ভবত পার্শী হবেন। একটা জিনিস বুঝলাম এখানে শাদাকালোর বর্ণভেদ নেই, আহারে-বিহারে সর্বত্রই সর্ব বর্ণের স্বচ্ছন্দগতি। আমাদের সঙ্গে যেসব শ্বেতাঙ্গ জাতিদের বেশি পরিচয় তারা তো কালোমানুষ দেখলে নিজেদের ভদ্রতা-সভ্যতা কেন, সময়ে-সময়ে মনুষ্যত্বও ভুলে যান। তাই এ দৃশ্যটা একটু নতুন।

বীকভা আমার সঙ্গে খাচ্ছেন বলে নিরামিষই খাবেন। তাঁকে আমিষ

খাওয়ানো গেল না। পুলি পিঠার মতো একরকম ভাপে সিদ্ধ করা দইয়ের মধ্যে ভেজানো বস্তু (আরিনিজ্‌) আমরা খেলাম। এলো এক ধরনের সুপ্‌। কিছু সব্জি সিদ্ধ। আর শেষে কমলালেবু—এটা অসময়ের ফল। এই বরফের রাজ্যে এ সময়ে সবুজের চিহ্নও নেই। শাক-সব্জি-ফল-মূল যা জীইয়ে রাখা হয় তাই মাত্র পাওয়া যায়। সত্যই তা দুর্ঘট। নিরামিষ খাওয়া জীবদের সাহচর্য রক্ষাও তাই সুবিধার নয়। আহারান্তে বাইরে যাব ঠিক করলাম। এখানে সর্বত্রই গৃহমধ্যে প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি গরম কোট জমা দেবার জন্য একটি স্থান থাকে গাদোরোব বা বহির্বাসিক কক্ষ। যিনি সেসব দেখাশোনা করেন, আমায় অনভ্যস্ত দেখে অগ্রসর হয়ে কোট পরতে তিনি সাহায্য করলেন। বাইরে এসে আমরা একটি ট্যাক্‌সি ধরে চললাম মস্কোর সুবিখ্যাত চিত্র সংগ্রহালয় 'ত্রেচিয়াকভ্‌ আর্ট গ্যালারি'তে।

'ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারি' বলতেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কথা। ১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। এই ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারির অধ্যক্ষ প্রফেসর ক্রিস্টি সেই সংগ্রহ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তাঁর উদ্বোধন ভাষণে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের কৃতি ও পদ্ধতি তাঁদের রুশদেশের লোকের শিক্ষার বিষয় হবে—এই মর্মের কথা। তখনো কবির ওঁরা সমাদর করেছিলেন। এখন তো রবীন্দ্রনাথ ওঁদের সকল লোকের পূজ্য।

ত্রেচিয়াকভ আর্ট গ্যালারি শুধু মস্কো বা সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর মধ্যেই একটি বৃহৎ চিত্রপ্রদর্শনীশালা। শুনেছি লেনিনগ্রাদের 'হারমিটেজ' ও প্যারিসে 'ল্যুভ' পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। কিন্তু মস্কোর এ চিত্রশালাও বিরাট ব্যাপার। একদিনে, তা পুরো দেখা ছেড়ে অংশতও ভালভাবে দেখা হয় না। দেশ-বিদেশের কত ধারার চিত্রই না আছে। ছবির সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি আমার জানা নেই, তবে ছবি দেখতে আমার ভালো লাগে। রং ও রেখার বিন্যাসে, এক-একটা উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—চোখে আর মনেও। চোখের মধ্য দিয়ে মন যেন আরও-একটা জগতের স্পর্শ লাভ করে। সুতরাং, মানস-ভোজের এই বিপুল সমারোহ দেখে আমার মন লুব্ধ হয়ে উঠল। আমার মতো উদ্ভিদ্-প্রকৃতির স্থাবর মানুষও যতটা জঙ্গম হতে পারে, সে চেষ্টা জুড়ে দিল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আমরা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে চিত্র ও মূর্তি শিল্পের নিদর্শন দেখলাম। পথযাত্রীর শ্রান্তি তখনো আমার দেহে,

নিরামিষাশী হলেও ক্ষুৎপিপাসা সামান্য নয়। দুদিন ধরেই সেদিকে ঘাটতি পড়েছে। এতটা যে পদবল আছে তা মনে করি না। তবু পারলাম—মনের খুশির জোরেই বোধ হয়। ছবি দেখতে-দেখতে দেহে ক্লান্তি এলেও মন খুশি হয়ে উঠছিল। নানাদেশের চিত্রই আছে, কিন্তু বেশির ভাগ চিত্রই রুশ চিত্রকরের অবদান। অন্তত আমি সেদিন সেগুলোই দেখছিলাম—অন্য চিত্রকলার সংগ্রহকক্ষে পদার্পণের অবসর অন্যত্রও পাওয়া যাবে। রুশিয়ায় এসে রুশ শিল্পকলাই প্রথম দর্শনীয়—রুশিয়াকে জানার জন্য। তবে এই রুশ চিত্রকলাও কম বিচিত্র নয়। চিত্রকলার জগতে রুশের স্থান কোথায় তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই চীন বা জাপান, ইতালি বা ফরাসীর সমকক্ষ নয়। তবু এদের ছবি যা দেখলাম তাও নানা আকারের নানা ধরনের, নানা পদ্ধতির ও নানা যুগের। সাজানো হয়েছে সাল তারিখ ধরে পুরাতন থেকে নতুনের দিকে—নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে। শুনেছি—শিল্পে ওরা বাস্তবতার পক্ষে, আর জন-জীবনই ওদের শিল্পের উপাদান। নতুন যুগের এই ছাপ চিত্রের পদ্ধতির মধ্যেও স্পষ্ট, চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যেও লক্ষণীয়। তেলের রং-এর ছবিতেও বর্ণপ্রাচুর্যের ঘনঘটা লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের ছবিতে। তার পূর্বেকার ছবিও অনেক, তাতে ঝলমলে নীল ও সোনালি রং-এর ঐশ্বর্য। আর, আধুনিকতর ছবিতে রং-এর ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও হালকা। দেখছি, ফরাসী-আধুনিকতার প্রকাশও ঘটেছিল এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদের চিত্রকলায়, কিন্তু এযুগে রুশদের তাতে আপত্তি। তবু শুনেছি তার চর্চা হয়। অবশ্য বিমূর্ত বা এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের উপহার দেখছি কম। মোটের উপর অজস্র আছে বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপ এবং বেশির ভাগই পোরট্রেট, সেই পোরট্রেটের বিষয়বস্তুও কালক্রমে বদল হয়েছে। এককালে ধর্মের ও রাজার সেবাই ছিল শিল্পীর কাজ। সেই আইকন, বা বিগ্রহ-পট শিল্পে রুবেলভ অদ্বিতীয় শিল্পী। এসব ধর্মবিষয়ক চিত্র রুশ সংস্কৃতির গৌরব। সমগ্র আঠারো শতক ও উনিশ শতকের ছবির মধ্যে জেগে আছেন সামন্ত প্রভুরা—রাজারাজড়া, শিকারী বা যোদ্ধবেশী, রাজপুত্র-রাজকন্যা এবং সম্রাজ্ঞীরা। সম্রাজ্ঞী জারিনা ইকাট্রিনা বা ক্যাথারিনের নানা বয়সের নানা পোরট্রেট রয়েছে। এই সব রাজতন্ত্রীদের প্রশস্তিসূচক শিল্পসম্পদও সযত্নে পরিষ্কার করে রাখা। ইতিহাসের বিষয়কে মান্য করতেই হবে। ক্রমশ দিন যত বদলেছে ততই রাজরানীদের স্থান গ্রহণ করেছেন সাধারণ লোকেরা—কারিগর, বৃদ্ধ চাষী, চাষীর মেয়ে, এবং

... শত শত জীবনযাত্রার সাহসী মানুষ। জীবনযুদ্ধের তারাই তো আসল ...—প্রাণ হননের যুদ্ধ নয়, প্রাণ প্রকাশের যুদ্ধ তাদের।

ছবি সম্বন্ধে আমার কোনও বিশেষজ্ঞতা নেই। তবু রং-এর ও রসের ... দরবারে আমিও হারিয়ে যেতে লাগলাম। রেপিন্ (মৃত্যু ১৯৩০) ওদের ...শিল্পের গুরু। তাঁকে আমার ভালোই লাগে। তাছাড়া, উনিশ শতকে ... ভেরেশ্চেগিন প্রভৃতি জন কয় বড়ো বাস্তবপন্থী শিল্পী এ-পথটা প্রশস্ত ...। এটাই এখন রুশ শিল্পের সরকারী পথ। আমি কিন্তু তার চেয়ে ...সী ধারার মডার্ন শিল্পই বেশি ভালোবাসি। তবু এ চিত্রশালার অনেক ...বি আমার ভালো লেগেছে। যে ছবিটি এখন আমার সবচেয়ে ভালো লাগল ...র কথা বলেই তাই এই চিত্রশালার কথা এবারের মতো শেষ করি— ...শায়ান্তর দেখছি না। সে চিত্রটির বিষয় হলো খ্রীষ্টের আবির্ভাব।

একটা প্রকাণ্ড ঘরের একটা পুরো দেওয়াল জোড়া এই ছবি। তাতে ... শত মানুষ যে স্থান লাভ করেছে তা বলা শক্ত। আমি এত বড় ...নভাস আর দেখি নি। অবশ্য এ চিত্রের খ্যাতি শুধু সেজন্য নয়। চিত্রকর ...ভানভ্ ?) উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি নাকি জীবনে একখানা ...ই এঁকেছিলেন—সেই 'একখানা' এই ছবি। এরই পরিকল্পনায় অংশ-...রূপে তিনি যে অজস্র চিত্র এঁকেছেন, এই বৃহৎ কক্ষের অন্য কয়টি ...য়াল ভরে পৃথক পৃথক ভাবে সে-সব সাজানো রয়েছে। মুখ মূর্তি জন দি ...টিস্ট, হাত উঠিয়ে তিনি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করছেন। বাইবেলের বর্ণনা ...ই দীক্ষাগুরু জনের পরিধানে উটের লোমের কাপড়। যীশুর পরিধানে ...দীর্ঘ পরিচ্ছদ। গ্যালিলিও সাগরের বন্ধুর তটপ্রদেশের একটু উপর ... তিনি নামছেন। সাধারণ মানুষ চারদিক থেকে তাঁকে দেখছে, উৎকণ্ঠায়, ... পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে—এই কি সেই মেসায় বা পরিত্রাতা ? ...নতর এই মেসায়া ? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, দুঃস্থ পীড়িত, রোমের পদানত ...ল জাতি নিবিষ্ট আশায় এই ছবিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ...ক্তি মতে তিনিই য়িহুদীদের 'রাজা'—কিন্তু কি অর্থে তিনি 'রাজা ?' ...টি মানুষের আশার স্বপ্ন এই পরিত্রাতা বা মেসায়া ? প্রতিটি ব্যক্তিচিত্র ..., আর প্রতিচিত্রের এক-একটি বিশেষ ভঙ্গী ও রস তার নিজস্ব অপূর্ব ...। যে বৃদ্ধ জীবনযাত্রায় নানাভাবে ক্লেশ পেয়েছেন তিনি তাকিয়ে ... একটা প্রশান্ত প্রত্যাশা নিয়ে। তাঁর হাতের কাছে যে বালিকাটি

দাঁড়ানো তার মুখে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি কোনও 'অপূর্বে'র আভাস—যা সে ক্রমাগত বড়দের কাছে শুনেছে—তার নিপীড়িত শৈশবের মুক্তিস্বরূপ কল্পনা করছে। এরূপে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবনস্বপ্নের পূর্ণোপলব্ধির প্রয়াস খ্রীষ্টের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই চিত্রটি এজন্য এমনভাবে আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। বহু সময়ই আমার মন স্মৃতিতে এই ছবির রস রোমন্থন করে। এমন সত্য কী আছে যাতে মানুষের বিচিত্র জীবন-লীলার ধারা চরিতার্থতায় সম্পূর্ণ? আমার স্মৃতিতে এই শিল্পীর নাম কতদিন ধরে রাখতে পারব জানি না, কিন্তু চিত্রটি টি঻কে থাকবে। শুনেছি লেনিনগ্রাদের চিত্র সংগ্রহশালাতেও এই ছবি আছে। সেইটিই সম্ভবত মূল—তবে কোন-টি প্রতিলিপি ও কোন-টি আসল তা আমার জানা নেই।

এই ছবি দেখতে আমার অনেকটা সময় গেল। আর বেশি ছবি দেখা সম্ভব হল না। কয়েকটি বালক-বালিকা স্কুল থেকে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে এসেছে। এমন প্রতিদিনই অনেক দল আসে। অনেকে নোট নিচ্ছে। কেউ বা কিছু কিছু অনুকৃতিও করছে। দু' চারটি ফুলের মতো সুন্দর মুখ কাছে এগিয়েও এল। বিদেশীকে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। অবশ্য আমি বুঝলাম—বিদেশী মানুষটির থেকে বিদেশীয় শাড়িটি তাদের প্রথম কৌতূহলের সামগ্রী—হয়তো বা প্রধানও। শিষ্টাচার জানাতে হলে এরা বলে 'দ্রাস্তুইচে' অর্থাৎ নমস্কার। আর বিদায়কালে বলে 'দোঃস্বিদানিয়া'—অর্থাৎ 'পুনর্দর্শনায় চ'। এই কয় ঘণ্টায় পুরনো শেখা শব্দ দুটি আমারও প্রায় রপ্ত হয়ে আসছে। শিরস্ত্রাণ ও কবচ কুণ্ডল পরে আমরা যখন বাইরে এলাম তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। রাত্রি বোধহয় ঘণ্টা দুটিন আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

শীতের সন্ধ্যা জমে আসছে। দিনের কুয়াশা-ঘেরা সূর্যহীন সূর্যালোক থেকে রাতের কুয়াশা-ঘেরা বিজলী আলোয় মস্কোর পথঘাট বোধহয় বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু শীতটা বিভীষিকা—তাতে সাধ করে পথে ঘাটে কেউ বেড়ায় না। দিনের বেলা বরফের উপর খেলা করে বটে, আর বরফে ওদের পরম আনন্দ।

বীকভা আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁরই গৃহে আমার রাত্রি আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। শুনলাম তাঁদের বাড়ি মস্কোর একটা নূতন অঞ্চলে ঠিকানা থেকে নাম জানি চেরামুষকিন্স্কায়া। নূতনতর অঞ্চলেও নর

পত্তন হয়েছে। আমার পক্ষে নূতন বা পুরাতন সবই অচেনা। কেবল প্রশস্ততর পথ ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অট্টালিকামালা দেখে বুঝছিলাম—এটা নতুন মহল্লা। বীকভার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড ফটক পেরিয়ে এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছালাম—৭।৮ তলা চকমিলান অট্টালিকা। বীকভাদের গৃহ তিন তলায়। তিনখানি ঘর এবং রান্নাঘর স্নানঘর সমেত একটি ক্বারচিরা বা ফ্ল্যাট। এরূপ তিন, দুই বা এক কামরা যুক্ত নানাধরনের ফ্ল্যাট সকল লোকের জন্য সোভিয়েত সরকার ব্যবস্থা করতে প্রয়াসী। একটি কো-অপরাটেব সমিতির সদস্য হিসাবে এরা সমিতির তৈরী এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। আর কিনে ফ্ল্যাটটির মালিক হয়েছেন। বীকভার গৃহে আছেন তিনি ও তাঁর স্বামী ঈগর (শেপ্তুনভ্), তাঁদের দুটি কিশোরী কন্যা আর বৃদ্ধা শাশুড়ী। আরও একজন আছেন। ঘরের অন্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সেও বার হয়ে এসে যথারীতি আমায় পর্যবেক্ষণ করল। সে এক ইরানী রূপসী—বীকভার 'পার্সিয়ান ক্যাট' বা ফার্সী মার্জারী। এদেশের লোকে বিড়াল অনেকেই পোষেন। শীতের দেশ বলেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক—বিড়ালের দেহ রোমশ এবং খুব হৃষ্টপুষ্ট। লেনিনগ্রাদে শুনেছি ব্লকাডের (যুদ্ধাবরোধের) সময় লোকে কুকুর বিড়াল ইঁদুর পায়রা ও কাছাকাছি পাবার মতো সর্বপ্রকার পশুপক্ষী খেয়েই প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আর সহস্রে সহস্রে তাও পারে নি। বীকভার বিড়ালী তো রীতিমত সুন্দরী। আমরা বসবার ঘরে এসে বসতেই সেও লাফ দিয়ে একটি চেয়ারে বসল। কোনও অজ্ঞাত কারণেই হবে হয় তো—বিড়াল আমার ভালো লাগে না। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে, মিলুক। তবে এই বিড়ালটি দেখে আপাতত আমার দেশে রেখে আসা কুকুরটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। কুকুরটি 'কুলীন' নয়, বংশজ। তিব্বতী ও নেপালী পিতামাতার সন্তান, ম্লেচ্ছ পাহাড়ীয়াও বলা যায়। ঐ সারমেয়েটির নাম ভুতো। তার বহুবিধ ভৌতিক উপদ্রবের মধ্যে একটা এই যে, আমাদের বসবার ঘরে লোক এলে তাকে ভিতরে কিছুতেই রাখা যেত না। খুলতেই হতো, এবং খোলামাত্র সে এসে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে পড়ত। কমিউনিস্টের বাড়ি হলেও এতটা সাম্যবাদ আমার সহ্য হয় না। তাই সে তাড়না খেয়েছে অনেক। কিন্তু ভুতোর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয় নি। অযথা আমাকেই শুনতে হয় আমি 'নাই' দিই বলেই নাকি সে উচ্চতর স্থানেও চড়ে বসছে। আপাতত বীকভার

বিড়ালটির জন্য দুঃখবোধ করলাম। বীকভা, অর্থাৎ তার মনিব, সেদিন দ্বিপ্রহরে আমার জন্য পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য খেয়েছেন—এখন এবেলাও সপরিবারে তো বটেই, স-পোষ্য অর্থাৎ এই বিড়ালটি শুদ্ধ আমার দায়ে শাকাহারে থাকতে হবে। দেশে থাকতে নিজেকে খুব এডাপটিবল বা খাপ খাওয়াতে সক্ষম বলেই ধারণা করতাম। এদেশে যাত্রা করে মাটি ছোঁবার আগে আকাশে বসেই বুঝেছি—কত ভুল ধারণাই মানুষের নিজের সম্বন্ধে থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস জিনিসটা খাদ্য ব্যাপারে কতটা বদ্ধমূল। মানুষে-মানুষে জানা-বোঝাও বোধহয় তার চেয়ে সহজ। আমরাই কি ভাবতে পারি—জোর করে কোনো মিষ্টিতে অনভ্যস্ত মানুষকে আমাদের রসগোল্লা খাওয়াতে গেলে তার দশা হয় আমাদের জোর করে আরসোলা-ব্যাং খাবার মতো ?

বীকভার বাড়িতে এসে রুশ সমাজের একটি স্বচ্ছন্দ পারিবারিক রূপ দেখতে পেলাম। এরা বুদ্ধিজীবী পরিবার। ঈগর তাঁর মায়ের একমাত্র ছেলে। পুত্রবধূ শাশুড়ীকে নিয়ে সংসার করেন—এদেশে তা স্বাভাবিক, ওদেশেও একেবারে অদ্ভুত নয় এখনো। বৃদ্ধা মা দু হাত বাড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করে আমার কপাল চুম্বন করলেন। করমর্দনের থেকে তা বেশি ভালো লাগল। পায়ে বাতের ব্যথায় বৃদ্ধা লাঠি ধরে চলেন। নাতনী দুটিকে নিয়ে তিনি এক ঘরে থাকেন। বুঝলাম তাতে ঈগর দম্পতিরও কতকটা ভাবনা লাঘব হয়েছে। পুত্র-পুত্রবধূ তো এতক্ষণ নিজ নিজ কর্মস্থলে ছিল—ঈগর স্লাব-সাহিত্যের ইনষ্টিটিউটের বিদ্বান কর্মী, এইফগেনিয়া প্রাচ্যবিদ্যা ইনষ্টিটিউটের ভারতশাখার কর্মী। নাতনীদেরও স্কুল কলেজ ছিল। বৃদ্ধাই স্বহস্তে আমার জন্য রান্নাবান্না করেছেন।

তাঁর স্বামীর জীবনকালে তিনি ককেশস অঞ্চলে ছিলেন। সেই ককেশস প্রীতি এখনও জেগে আছে গৃহসজ্জায়, আর খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীতে। টেবলের উপর হলদে রং-এর বাবলা ফুলের মতো ফুলসুদ্ধ মিমোসার ডাল। শীতে ফুল দুষ্প্রাপ্য, ককেশাস থেকে এটি নববর্ষ উপলক্ষে তাঁরা সংগ্রহ করিয়ে এনেছেন। নববর্ষের কিছু কিছু বেশভূষা তখনও ঘরে রয়েছে। জানালার উপর দেখলাম কয়েকটি গাছের টব—বীকভার ভাষায় "আমাদের বাগান"। সেই টবের একটি লেবুগাছে একটা কমলালেবু জাতীয় মাঝারী সাইজের ফলও ফলে আছে। পাতাগুলি সবুজ; কেন্দ্রিক আতপ-ব্যবস্থায় ঘরের মধ্যে তাপ পায়, জানলা দিয়ে পায় সূর্য থাকলে সূর্যের আলো। অন্য কোনোও গাছে এ নিদারুণ

শীতের সময়ে পাতা থাকে না। ঘরে বেশ কয়েক আলমিরা বই—স্বামীর বই আমার দুর্বোধ্য, কিন্তু বীকভাব বাঙলা বই আমাকে কম আশ্বাস দিল না।

বীকভার কন্যা দুটি কাছে এলো। দুজনাই ইংরাজী বলে। ঈরিনা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাটি ভালোই বলে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজির ছাত্রী। ললিতকলায় তার আকর্ষণ। নানা পুরাতন মসজিদ ও চার্চের ডিজাইন ও 'মোঝিকে'-এর আলোকচিত্র তার কাছে আছে। সেগুলি তাদের শিক্ষালয়ের এক্স্‌কার্সান বা পরিভ্রমণযোগে সংগ্রহ করা। মায়ের মতনই সে স্নিগ্ধপ্রকৃতি; তার কৃশতনুর মধ্যে মায়ের মতোই একটি কারুণ্য ও মাধুর্য। ছোটটির নাম ওল্‌গা, একটি ফোটা ফুলের মতন নিটোল পঞ্চদশী সুষম কিশোরী। চোখ মুখ কি বাপের মতো (তখনো তাকে দেখি নি)। পরে বুঝেছি অন্তত সেই রকমই ওল্‌গার স্বাস্থ্যের সতেজ প্রাচুর্য। বীক্‌ভাই বলেছেন, গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে কিছুকাল অবরুদ্ধ অঞ্চলে যাপন করতে হয়েছে। ইরিনা তখন কোলের শিশু। শত্রু-পরিবৃত অঞ্চলে বাস করার ফলে মাতা ও শিশু দুজনারই স্বাস্থ্য তখন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধ গিয়েছে, কিন্তু এত বৎসরেও সেই ক্ষতি পূরণ হয় নি স্বাস্থ্যের দিক থেকে। বুঝতে পারি কেন এরা শান্তি চায়—যুদ্ধ চাইতে পারে না।

রাত প্রায় ৯টায় গৃহস্বামী ঈগর শেপ্তু্‌নভ্‌ মহাশয় কাজ সেরে গৃহে ফিরলেন। দীর্ঘ দোহারা গড়নের মানুষ, বয়স চল্লিশের থেকে কিছু বেশি হতে পারে, চোখে মুখে বুদ্ধির সঙ্গে কিন্তু প্রাণবন্ত সতেজতা। ঈগর স্লাবগোষ্ঠীর বুলগেরীয় ভাষায় বিশারদ—এফগেনিয়া যেমন আধুনিক ভারতীয় ভাষার বাঙলা শাখার বিশেষজ্ঞ। বীকভা আমাদের দেশের অনেকের পরিচিতা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে শুনেছি—চট্টোজায়াকে শুনেছি তাঁর স্বভাবের প্রশংসা করতে। ইতিপূর্বে রুশ-বাংলা অভিধান তিনি সংকলন করেছেন। বাংলা ব্যাকরণে, বিশেষ করে উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়েও তাঁর কাজ আছে। চর্যাপদের ব্যাকরণ সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা দেখেছি। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য এই মহিলাকে এমন একটি সৌন্দর্য দান করেছে যা সচরাচর দেখা যায় না, সেই আবেদন-সম্পদ সর্বদেশে সকল মানুষের কাছেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মীয়তা তাঁর সোভিয়েত সহকর্মীদেরও জ্ঞাপন করতে শুনেছি। অথচ তিনি কথায় মুখর বা বাক্যে প্রখর নন; বরং একটু কোমলস্বভাবা

ও সস্নেহভাষিণী। আমার কুনো স্বভাব খুব সহজেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। বেশ সহজ হৃদ্যতার সঙ্গেই আমরা এই কয় ঘণ্টার সাক্ষাতে পরস্পরকে গ্রহণ করলাম। ঈগর মহাশয় একটি বেগবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ; যাকে বলে dynamic personality; তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার রসবোধ বা সেন্স অব্ হিউমার। সাহিত্যের লোক তিনি রসবোধ থাকবে সেকথা আশ্চর্য নয়। তবুও বিশেষ করে বলার মতো কথা এই যে, স্ত্রীর মতন স্বামীটিও ভদ্র রুচিশালী এবং হৃদয়বান। আর মুগ্ধ হয়েছি তাঁর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে witticism ও humour—রসিকতা ও কৌতুক—করার ক্ষমতায়। মস্কোতে তো আমার সেদিন প্রথম দিন, দ্বিতীয় রাত্রি—ভাষা কিছুই জানি না। তবু মনে হলো ভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও কোনোরূপ ভাব গ্রহণ করতে পারলে হিউমার সর্বজনবোধ্য এবং সর্বচিত্তহারী। তবে একথা মানতেই হবে যে, ঈগরের হিউমারের নিজস্ব শক্তি এইফ্‌গোনিয়ার অনূদিত বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আমার কানে ও বুদ্ধিতে প্রবেশ করেছে। কিছু নিশ্চয়ই তাতে খোয়া গিয়েছে, তবে তা তবু স্বচ্ছন্দ। বন্ধুর স্বামীদের সঙ্গে দেশে যে ভাবে শিষ্টাচার বজায় রেখেও পরিহাসসংকুল সম্পর্ক লাভ করে থাকি, এক্ষেত্রেও তা পেতে লাগলাম। ঠাট্টা-তামাশায় ঈগর সবাইকে হাসিয়ে আমায় বিপর্যস্ত করতে থাকলেন।

এই হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই আমাদের আহারও শুরু হলো। পাশ্চাত্ত্য দেশে সর্বত্রই খাবার পূর্বে পানে বিধি আছে। একেই তো আমি খাওয়া ব্যাপারে সংরক্ষণশীল, তার ওপরে বাঙালী মেয়ে, পান সম্বন্ধে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' বলা যায়। জীবন কাটছে সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চা করে, মাঝে সাধুসঙ্গও কম করি নি। কমিউনিস্ট মোগলের হাতে পড়েও খানা খাওয়ায় অভ্যস্ত নই—পানীয় তো দূরের কথা। সুতরাং, এ দেশের আচার ব্যবহার বুঝে জেনেও, সামাজিক আসরে পদে পদে রসভঙ্গ ঘটানো আমার বিধিলিপি। ত্রুটি বুঝতে পারি, তার জন্য ক্ষমাও চাই, কিন্তু তা সংশোধন করি না, আমার পক্ষে তা অসম্ভব বলে। এ ক্ষেত্রেও শ্রীযুত ঈগর আমার 'জাত যাওয়ার' ভয় দেখিয়ে হাস্য-পরিহাসে আমাকে কম নাকাল করলেন না। আমার জন্য পানীয় ছিল টেবলে তাঁর মার হাতে প্রস্তুত বেরির রস—তা সুরা নয়। লাল টুকটুকে সেই রসই পানপাত্রে পরিবেশিত হলো। আমরা পরস্পরের গ্লাস ছুঁইয়ে এই সরস উপায়ে পরস্পরের প্রীতিবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য কামনা করে তা

...করলাম। এ ছাড়া অবশ্য অন্য পানীয় ছিল 'লিমোনাদ'। আহার্য ছিল ...নিরামিষ—যথা, গাজর, বাঁধা কপি, বরবটি সিদ্ধ, নিরামিষ সালাদ, গরম আলুর ...। আলুর বড়া এরা 'স্মিতানা' বা টক্ মালাই মিশিয়ে খান—এটা তাই ...হলেও লেহ্যও। এরপর ছিল মিষ্টান্ন—কেক বা তর্ত ও চকোলেট। ...লেমন চা সেই সঙ্গে পেয়। অবশ্য আমিষের ব্যবস্থাও ছিল। টেবলে ...আমার সঙ্গে নিরামিষাশী। আজ আর কেউ আমিষাহার না ...লেও মহামান্য আমিষাহারীকে অসম্মান করা হয় নি। বিড়ালটির ...দের ব্যবস্থা আছে। রান্না হয়েছিল প্রাচ্য ধরনে—অর্থাৎ ককেশীয় প্রণালীতে ...মশলা ও ঝাল তাতে প্রযোজ্য। তার ফলে সে খাদ্য খেতে আমার বেশ ...মুখরোচক লাগছিল। দু দিন খাদ্যে এ গুণ পাই নি। এ রান্নায় কতকটা আমাদের দেশের খাদ্যের বা তরকারির স্বাদগন্ধ পাচ্ছিলাম যেন। বুলগেরিয়া থেকে প্রাপ্ত বড় ও মিষ্টি লংকার একরকম সংরক্ষিত আচারও খেলাম। এরকম লংকা আমাদের দেশেও শিলং, রাঁচী ও সিমলা শৈলে পাওয়া যায়। আমিও তা খেয়ে শ্রীযুক্ত ঈগরকে জানালাম—'বুলগার ভাষার পণ্ডিত যখন ...তখন যে বুলগারিয়ান সব্জীও তাঁর বাড়িতে মিলবে এ আর আশ্চর্য কি!' ...খাওয়ার শেষে এলো ফল। কলা ও আপেল। এ দিনে যে-কোনো ফল ...র্থ। শুনলাম সেই কলা এসেছে কিউবা থেকে এবং আপেল সম্ভবত চীন থেকে। কলার চেহারা দেখে প্রথমত খেতে রুচি হচ্ছিল না। আমরা ...কলা-কুশল' দেশের লোক। দেখতে কিউবার কলাও সবুজ সিঙ্গাপুরী কলার ...রা—খেতেও অনেকটা তদ্রূপ। 'লেমন-চা' আমার বাড়িতে আমার স্বামীকে ...কখনো কখনো বিদেশী অতিথিদের, পান করতে দেখেছি। নিজের ...মন ভালো লাগত না। এখানে দু'দিনেই ঐ পানীয় আমার গ্রাহ্য হয়েছে। ...বলে আমি অভ্যাস পাল্টাতে অক্ষম? যে ধরনের চা আমি চিরদিন ...তে অভ্যস্ত নিজের হাতে তৈরি না করলে এখানে তা পাব কি করে? ...বুঝেই লেমন-চাও ভালো লাগে।

আহারান্তে বিশ্রাম্ভালাপের পালা দীর্ঘ করা সম্ভব নয়। হোটেলে ফিরতে ...র। কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা প্রভৃতি বিনিময় করে ফিরবার জন্য তৈরি হলাম। ...বার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা আমাদের দেশের মায়ের মতনই স্নেহপরায়ণা। ...কে অভিবাদন জানিয়ে ওভারকোট গায়ে দিলাম। তখনো আমার নিজস্ব ওভারকোট কেনা হয় নি। ও বস্তুটি আমার নয়। আমি এর নাম দিয়েছিলাম

'কলেকটিব্' কোট্। রাশিয়ায় আমার আগে বাংলা দেশ থেকে দু' একজন মহিলা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই এই শীতকালীন ওভারকোট্ ব্যবহার করেছেন। তারপর দেশের পথে তা যথারীতি জমা দিতেন নয়াদিল্লীতে রেণুদির বাড়িতে। পার্লেমেণ্টারি দায়িত্বের সঙ্গে শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তীর অন্যতর দায়িত্ব এ কোটটির পরিচর্যা—তা ঝেড়ে ধুইয়ে তুলে রাখা—এরূপ অন্য যাত্রীদের জন্য। আমিও অবস্থাগতিকে সেই কোটটি গায়ে চাপিয়ে এসেছি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আমার মাপটা বোধহয় এই কোটের তুলনায় প্রমাণসই নয়। নিজেকে কোটের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেব, এমন ক্ষমতাও আমার নেই। অন্য কেউ তা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও শ্রীযুক্ত ঈগর রঙ্গ-তামাসার সুযোগ ছাড়লেন না। সহজভাবে বেশ খানিকটা হাসালেন ও হাসলেন। যথার্থ হিউমার মানুষকে বিব্রত না করে স্বচ্ছন্দ করে দেয়। শ্রীমতী বীকভার সঙ্গে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। আমায় পৌছিয়ে রাত এগারোটার সময় তিনি ঐ প্রচণ্ড শীতে বাড়ি ফিরলেন। ধন্যবাদের ভাষা নেই। আমার জন্য আজ তাঁর সমস্ত দিনটিই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে; এতক্ষণে তার নিজস্ব বিশ্রামের সময় পাবেন।

সারা দিনের পর বিশ্রাম আমারও চাই। সেই বিশ্রাম করতে করতে আমিও আমার চব্বিশ ঘণ্টার বাসস্থান এই বিরাট উক্রেইনা হোটেলের এই ঘরখানিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম। একজনের মতো শয্যা, টেবল, আয়না লাগানো আলমারি; ঘরটির সামনে ছোট একটি কক্ষ (ante-room) যেখানে আমার মালপত্র রয়েছে, তা চোখে পড়ল। পার্শ্বেই গরম জলের জলের কল-লাগানো আধুনিক বাথ। ত্রুটি কিছুর নেই। তবু আমার মনে হলো যে, বোধ হয় ইংরাজ শাসনের সময়কার স্পেন্সেস্ বা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ছিমছাম পারিপাট্য ছিল এর চেয়ে বেশি। এখানেও অবশ্য আছে সবই। বরঞ্চ প্রাচুর্যই আছে। কিন্তু সৌন্দর্য পারিপাট্য পরিচর্যা কিছু কম। দিল্লীর সোভিয়েত দূতাবাসের রাজকীয় কক্ষে বসেও এ কথা আমার মনে হয়েছে। কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের সোভিয়েত ট্রেড ব্যুরোর বসবার ঘর, ওদের কন্সুলেট্ দেখেও মনে হতো। এই হোটেলের খাবারঘরের ব্যবস্থাতেও সেই ধারণাই জন্মায়। শ্রীযুক্তা বীকভার বাড়িতে অবশ্য একদিন সহজ বোধ করেছি—স্বচ্ছন্দ পরিবেশ পেয়ে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সকাল সন্ধ্যা ব্যস্ত, এজন্য ঘরবাড়ির পারিপাট্যের বাঁধনে অতটা উৎসাহী হতে তাঁরা

পারেন না। পশ্চিম ইউরোপের জীবনযাত্রায় যে একটা বাঁধা-ধরা ছাঁদ ও কঠিন পারিপাট্যের রীতি আছে, যতোটা জানি, অন্তত ইংরেজ-জীবনে তার নড়-চড় হবার উপায় নেই। কিন্তু আহার-বিহারে ভোজন-শয়নে সেই সযত্ন চর্যা এখানে কোথাও তেমন অনমনীয় নয়। গৃহেও নেই, হোটেলেও নেই। মনে হয়েছে হয়তো সমাজবাদী সমাজে দৈনন্দিন জীবনে কন্‌ভেন্‌শন্, বাঁধাবাঁধি, সাজানো-গোছানো অপ্রয়োজন বোধে লোকে যত্ন করে তা চর্চা করে না। হয়তো বুর্জোয়া ভ্যালুর এ-দিকটা এখানে ক্ষীণায়ু হয়ে পড়েছে অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো। প্রাণ দিয়ে এরা এখনো সমাজ গড়ছে, যত্ন করে তা সাজাতে মন দিতে পারছে না। সমাজটাকে ঢেলে সাজাতেই ব্যস্ত, সাজাতে-গুছাতে পালিশ লাগাতে সময় পায় নি। অল্প সময়ের মধ্যেও যা চোখে না পড়ে পারে নি তা হলো রুশ্ জীবনের আনকন্‌ভেন্‌শেনাল, ঢিলে-ঢালা শিথিল-গতি ভাবটা। আমাদের দেশেও আমরা তার সঙ্গে পরিচিত—যতোই তাতে আরাম পাই তাতে আমি একটু হতাশও হই। এ হোটেলের বাসন-পত্র, টেবল-সজ্জা, পরিবেশন-রীতি সব কিছুতেই একটু অবহেলার ভাব। সেবক-সেবিকাদের গতায়াতে, পরিবেশনে যাকে বলে প্রোম্‌ট্‌নেস ও স্মার্টনেস্—তৎপরতা ও চট্‌পটে ভাব, তা ততো নেই। অথচ এদেশের লোক কঠিন পরিশ্রমী; জীবিকায়, কাজকর্মে, বিজ্ঞানে, কারুবিদ্যায় তো অসতর্কতা ও শিথিলতার অবকাশ নেই। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে হলো হয়তো বা এখানে এরা মনে করে প্রয়োজনটা মিটলেই যথেষ্ট। প্রয়োজনের অতিরিক্তও যে পারিপাট্য তার দিকে দৃষ্টি লোকে আগে দিতে পারত না, সেই অভ্যাসে এখনও দৃষ্টি দেয় না। এ কথায় সত্য যে কিছু আছে তার প্রমাণ পরেও পেয়েছি, দেখেছি। আমরা নিজেরাও তো এ বিষয়ে নিষ্পাপ নই—স্পুৎনিকের দেশে ঢিলেমি তবু অপ্রত্যাশিত।

একটি পরিপূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা কাটল মস্কো মহানগরীতে। বৈজ্ঞানিকের চোখ একটি সামান্য cross-section থেকে একটা সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পায়—বিচিত্র মানবজীবন ও মানবজগত সম্পর্কে। কিন্তু অনেক দিন বসে সেই চোখকে শিখতে হয় সে ভাবে দেখতে। এক দিনের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার কেন, বৈজ্ঞানিকেরও কিছু বলা শক্ত। এগারোই জানুয়ারির রাত থেকে বারোই জানুয়ারির সমস্ত দিনরাত পর্যন্ত আমার কেটেছে একে-একে টাশকেণ্টের যাত্রীশালায়, মস্কোর এয়ারপোর্টে, উক্রেইনা হোটেলে, মস্কোর

পথে পথে, একটি মহাসংগ্রহশালায়, এবং শেষে একটি পরিবারের সঙ্গে একত্র সন্ধ্যাযাপনে। কিছুটা সাধারণ জীবনযাত্রা দেখেছি, কিছুটা গৃহজীবনও। মনে হয় এই শীতের দেশের মানুষ পরিশ্রমী ও সহৃদয়। তবে convention (আচরণের বাঁধাবাঁধি) বা sophistication (সভ্যতার রুচিসূক্ষ্মতার) ধার বড়ো ধারে না। সেজন্য বরং প্রথম দর্শনে একটু অ-মসৃণ বা roughও মনে হতে পারে। ভূগোলে ইতিহাসে মিলে এসব অভ্যাসে পাকা হয়ে গিয়েছে—ঝেড়ে ফেলা যায় নি। পোশাক-পরিচ্ছদেও এই শিথিলতা আছে। থাকবেই বা না কেন? দুর্দান্ত শীতে সকল পরিচ্ছদই তো ঢাকা পড়বে ওভারকোটের তলায়, আলুর বস্তার মতো দেখাবে পল্লবিনী লতাটিও। দু'দিনের অ-কামানো-দাড়ি পুরুষকেও তাই লজ্জাবোধ করতে হয় না। 'জল ছুঁইতে ভয়'। আপাতত শত শত আকাশচুম্বী প্রাসাদের মধ্যে ছোট ছোট ফ্ল্যাটের সহস্র-সহস্র অধিবাসীরা দৈনন্দিন কাজ ও বিশ্রামের একটা সুস্থ ছন্দে নিজেদের ঢেলে দিয়েছে। এর ওপরেও যে ঢেলে সাজা যেতে পারে সে ধারণা থাকলেও সে ধারণাকে এখনো এরা মহামূল্য মনে করে না। আমার তো এই একদিনের দেখায় মনে হলো—একটা যুগের ট্রাডিশন শেষ হয়েছে, জার আমলের উৎকট জাঁক-জমক, আরেকটা যুগের প্রারম্ভ হয়েছে—শ্রমিক যুগের আয়োজন, ট্রাডিশন এখনো গড়ে ওঠে নি। তার জন্য আবার কতটা দায়ী এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, কতটা জাতীয় চরিত্র, তা বুঝি না।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—আমার প্রথম দিনের মস্কো জীবনও তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে গেল।

হামলা

জন স্টাইনবেক

ক্যালিফোর্নিয়ার এই ছোট্ট শহরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। খাবার-গাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকদুটি বড়ো বড়ো পা ফেলে উদ্ধত ভঙ্গিতে অলিগলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। বাতাসে গাজিয়ে-ওঠা ফলের মিষ্টি গন্ধ, গন্ধটা আসছে আশেপাশের চালানী কারখানা থেকে। রাস্তার কোণে কোণে অনেক উঁচুতে নীল আর্কবাতি হাওয়ায় দুলছে। নিচে মাটির ওপর টেলিফোন-তারের ছায়াগুলো নড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। পুরনো কাঠের বাড়িগুলো শান্ত, নিস্তব্ধ। নোংরা জানলা থেকে রাস্তার আলো ম্লান হয়ে ঠিকরে পড়ছে।

লোকদুটি আকারে প্রায় সমান, কিন্তু একজনের বয়স অনেক বেশি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে নীল জীনের পাতলুন। বয়স্ক লোকটির গায়ে জ্যাকেট, অপরজন পরেছে গলাবন্ধ সোয়েটার। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তাদের পায়ের শব্দ কাঠের বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। অল্পবয়স্ক লোকটি হঠাৎ শিস দিতে লাগল—'হিঁচকাদুনে খোকা আমার, আয়রে, আয়।' শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'দূর ছাই, এই সুরটা সারাদিন মাথার ভেতর ঘুরছে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আর গানটাও অনেক পুরনো।'

তার সঙ্গীটি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছে রূট। সত্যি বল, দারুণ ভয় পেয়েছ!'

একটা নীল বাতির তলা দিয়ে তারা যাচ্ছিল। রূটের মুখটা কেমন কঠিন দেখাল, আড় চোখের দৃষ্টি, বিরক্ত ও বিকৃত মুখের ভঙ্গি। বলল, 'না ভয় পাই নি।' আলোটা পার হয়ে যেতেই তার মুখের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল।—'এ সব বিষয়ে আমি যদি আর একটু পাকা হতাম! তোমার আর কি চিক, তুমি তো গা-সওয়া। তুমি আগে থেকেই বুঝতে পারছ কি হবে না হবে। কিন্তু আমি যে একেবারেই আনাড়ী।'

'কাজের ভেতর দিয়েই তোমাকে শিখতে হবে।' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ডিক্ বলল, 'শুধু বই পড়ে সত্যি সত্যিই কিছু শেখা যায় না।'

একটা রেলের লাইন তারা পার হয়ে গেল। একটু দূরে লাইনের ধারে একটা গম্বুজ। ছোট ছোট সবুজ আলো গম্বুজটার গায়ে তারার মতো ছিটিয়ে রয়েছে। রুট বলল, 'কী ভয়ানক অন্ধকার। চাঁদ বোধ হয় দেরিতে উঠবে। এই রকম অন্ধকার রাত্রিতে সাধারণত তাই ওঠে। আচ্ছা ডিক্, প্রথমে কি তুমি বক্তৃতা দেবে?'

'না, তুমি দাও। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। তুমি যখন বক্তৃতা দেবে আমি ওদের লক্ষ্য করব। তাহলে পরে আমার বক্তৃতায় জায়গা বুঝে ঘা দিতে পারব ঠিকমতো। তোমার বক্তৃতাটা তৈরি আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। আগাগোড়া আমার মুখস্থ আছে, প্রত্যেকটি কথা। কাগজে লিখে এটা আমি তৈরি করেছি। অনেকের মুখে শুনেছি যে তারা বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে কী বলবে ভেবে পায় না। তারপর হঠাৎ তারা শুরু করে যেন অন্য কেউ কথা বলছে আর তখন কথা বেরিয়ে আসে রাস্তার হাইড্রেন্টের জলের মতো হু হু করে। বড়ো মাইক্ শিরেনের মুখে শুনেছি ওর এ-রকম হয়। কিন্তু আমি অনিশ্চিতের ওপর ভরসা রাখি নি, বক্তৃতাটা আমি লিখে তৈরি করেছি।'

একটা ট্রেন আসবার শব্দ পাওয়া গেল। কেমন মরা কান্নার মতো বিশ্রী একটা শব্দ। পর মুহূর্তে বাঁকটা ঘুরতেই ট্রেনের ভয়ংকর আলোটা সোজা এসে পড়ল লাইনের ওপর। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে আলোকোজ্জ্বল কামরাগুলো পার হয়ে গেল একে একে। ডিক্ তাকিয়ে ছিল, ট্রেনটা চলে যেতে খুশিভরা গলায় বলে উঠল, 'না, ট্রেনটায় বেশি লোক নেই। আচ্ছা তুমি না বলেছিলে তোমার বাবা রেলে কাজ করে?'

গলার স্বরে তিক্ততা প্রকাশ না করবার চেষ্টা করে রুট বলল, 'হ্যাঁ রেলেই কাজ করে। ব্রেকম্যান্। জান, আমি এসব কাজ করি টের পেয়ে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে। বাবার ভয় যে চাকরি যাবে। কিছু বোঝে না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বাবা একেবারেই অবুঝ। একেবারে দূর করে দিল!' রুটের গলার স্বরে যেমন একটা নিঃসঙ্গতার সুর। হঠাৎ সে বুঝতে পারল সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার গলার স্বরেই প্রকাশ বাড়ির জন্যে সে কতখানি কাতর। কর্কশ স্বরে সে বলে চলল, 'ওদের মতো

লোকদের নিয়ে এই বিপদ। চাকরি ছাড়া ওরা আর কিছু জানে না। নিজেদের অবস্থা বুঝে দেখবার ক্ষমতাও ওদের নেই। পায়ের শেকলকেই ওরা আঁকড়ে ধরে আছে।'

ডিক্ বলল, 'কথাগুলো মনে করে রেখে দাও। চমৎকার বলেছ। এটা তোমার বক্তৃতার একটা অংশ নাকি?'

'না। কিন্তু তুমি যদি ভালো মনে কর তো ঢুকিয়ে দিই।'

এখানে রাস্তার আলোগুলো অনেক দূরে দূরে। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি লোকাস্ট গাছ দেখে বোঝা যায় যে শহর পাতলা হয়ে এসেছে। এবার গ্রামাঞ্চলের আধিপত্য শুরু হবে। কাঁচা রাস্তার আশেপাশে দু-একটা ছোট ছোট বাড়ি, বাড়িগুলোর সামনে অযত্নরক্ষিত বাগান। 'হা ভগবান!' রুট আবার কথা বলল, 'বেশ অন্ধকার দেখছি। কপালে কি দুর্ভোগ আছে কে জানে। যদি কিছু হয়তো পালাবার পক্ষে ভারি চমৎকার রাত কিন্তু।' জ্যাকেটের কলারের ভেতর থেকে ডিকের নিঃশ্বাস পতনের একটা ভারি আওয়াজ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে হেঁটে চলল দুজনে।

'আচ্ছা, ডিক্, তোমার কি মনে হয়—তুমি পালাবার চেষ্টা করবে না তো?'

'না, বলছ কি! পালাবার হুকুম নেই। যদি কিছু হয় তো সহ্য করতে হবে। তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। তোমাকে দেখছি ধরে রাখতে হবে, নইলে পালিয়েও যেতে পার।'

রুট রীতিমতো আস্ফালন করে উঠল, 'দু-একবার বাইরে এসেছ বলেই একেবারে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছ, না? ভাবছ, খুব ভারিক্কী চালে কথা বলা যাচ্ছে।'

ডিক্ বলল, 'যাই বল না কেন, কানের পর্দা কিন্তু আমার নেই।'

মাথা নিচু করে রুট হাঁটছিল। নরম গলায় শুধলো, 'ডিক্ তুমি ঠিক জান যে তুমি পালাবে না? জোর করে বলতে পার যে ওখান থেকে এক পাও না নড়ে তুমি মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারি। আগেও আমি এ কাজ করেছি। আর আমাদের ওপর হুকুমও তাই, নয় কি? এতে যে খানিকটা প্রচারের কাজ হয় তা তো ঠিক।' অন্ধকারে রুটের মুখটা ঠাহর করে সে আবার বলল, 'বল তো একথা কেন

তুমি জিজ্ঞেস করছ? তোমার বুঝি ভয় হচ্ছে যে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে? তা যদি হয় তো ফিরে যাও। তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না।'

স্কট কেঁপে উঠল, 'শোন ডিক্, তুমি ভালো লোক বলেই বলছি। কাউকে বোলো না কিন্তু। বলবে না তো? এ ধরনের পরীক্ষা আমার ওপর আগে আর হয় নি। ধরো কেউ যদি লাঠি মেরে আমার মুখটা ফাটিয়ে দেয়—তখন আমি কী করব তা আগে থেকে জানব কি করে? জোর করে কেউ বলতে পারে কি তেমন অবস্থায় সে কী করবে? আমার মনে হয় না আমি পালাব। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টাই করব।'

'ঠিক আছে। এসব কথা থাক এখন। কিন্তু জেনে রাখ, তুমি যদি পালাবার কিছুমাত্র চেষ্টা করো তো তোমার নাম আমি উড়িয়ে দেব। ভীরু কাপুরুষদের জায়গা এটা নয়। কথাটা তোমার মনে থাকবে তো?'

'হয়েছে, হয়েছে, তোমার সর্দারি থামাও তো। কথাটা বলে বলে যে একেবারে তেতো করে ফেললে।'

লোকাস্ট গাছের সারি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। বাতাসে গাছের পাতার খস্ খস্ শব্দ। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ওপাশের একটা উঠোন থেকে কুকুর ডাকছে। পাতলা একটা কুয়াশার স্তর নেমে আসছে বাতাসের ভেতর দিয়ে। আকাশের তারাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ডিক জিজ্ঞেসা করল, 'সব ঠিকঠাক করে এনেছ তো? আলো? বই? তোমার ওপরেই সব ভার ছিল কিন্তু।'

স্কট বলল, 'সারা বিকেল ধরে এই সমস্ত কাজ করেছি। শুধু পোস্টারগুলো এখনো মারা হয় নি। ওখানে একটা বাকসের ভেতর ওগুলো আছে।'

'বাতিতে তেল আছে তো?'

'অনেক তেল তো ভরা ছিল। আচ্ছা ডিক আমার মনে হচ্ছে কোনো হতভাগা নিশ্চয়ই খবরটা ফাঁস করে দিয়েছে। কী মনে হয়?'

'দিয়েছে বৈকি। এসব খবর সব সময়েই কেউ না কেউ ফাঁস করে।'

'আচ্ছা, আমাদের ওপর হামলা হতে পারে এমন কোনো খবর তুমি শোন নি?'

'কী আপদ! আমি কোত্থেকে শুনব বলতে পার? তুমি কি মনে কর যে ওরা আমাকে এসে বলবে যে আমার মাথার খুলিটা ওরা উড়িয়ে দিতে

চায়? সাবধান স্কট। ভয়ে জামাকাপড় খুলে পড়বার মতো অবস্থা হয়েছে তোমার। তুমি দেখছি আমাকে সুদ্ধ ভয় পাইয়ে দেবে।'

দুই

একটা নিচু চতুষ্কোণ বাড়ির কাছাকাছি ওরা এল। বাড়িটা কালো আর জমাট বলে মনে হচ্ছে। পাশের গলিপথটা কাঠের, চলবার সময় শব্দ উঠল ভীষণভাবে। ডিক বলল, 'এখনো কেউ আসে নি দেখছি। চল ঘরদোর খুলে আলো জ্বালিয়ে বসা যাক।' বাড়িটায় আগে একটা দোকান ঘর ছিল। শো-কেসের কাঁচগুলো ধুলোতে ঢেকে গেছে। কাঁচের একপাশে লাগানো একটা লাকিস্ট্রাইক পোস্টার, অন্য পাশে কার্ডবোর্ডের তৈরী প্রকাণ্ড কোকা-কোলা মহিলা-মূর্তিটি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। দুই-পাল্লা দরজাটা ঠেলে ডিক্ ভেতরে ঢুকল। দেশলাই বার করে কেরাসিনের বাতিটা জ্বালাল তারপর ঠিকভাবে বসিয়ে বাতিটা একটা উলটানো আপেলের বাক্সের ওপর রেখে বলল, 'এস স্কট, জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক করে রাখি।'

ঘরের দেওয়ালগুলো এবড়োখেবড়ো, চুনকামের কাজটা ঠিকভাবে করা হয় নি। এক কোণে ধুলোপড়া স্তূপীকৃত খবরের কাগজ ঠেলে রাখা হয়েছে। পেছনের জানলাদুটোয় মাকড়সার জাল। তিনটা আপেলের বাক্স ছাড়া দোকানঘরটার ভেতর আর কিছু নেই।

একটা বাক্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্কট প্রকাণ্ড একটা পোস্টার টেনে বার করল—চড়া লাল আর কালো কালিতে আঁকা একটা মানুষের মূর্তি। পিন মেরে পোস্টারটা সে আটকাল আলোর পেছনে দেওয়ালের গায়ে। তারপর ঠিক পাশেই আর একটা পোস্টার আটকাল—সাদা পটভূমির ওপর লাল প্রতীক-চিহ্ন। সবশেষে আর একটা আপেলের বাক্স উলটিয়ে এক গাদা ইস্তাহার আর কাগজের মলাট দেওয়া বই জড়ো করে রাখল। চলাফেরা করবার সময় অনাবৃত কাঠের মেঝের ওপর জোরে শব্দ হচ্ছে। স্কট বলল, 'অন্য আলোটাও জ্বালিয়ে দাও না ডিক্! কী বিশ্রী অন্ধকার।'

'অন্ধকারকেও ভয় করতে শুরু করেছ নাকি?'

'না। এক্ষুনি লোকজন এসে পড়বে। তখন তো আলো চাই। কটা বেজেছে বল তো?'

ডিক্ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'পৌনে আটটা। অন্তত দু-একজনের তো এবার এসে পড়া উচিত।'

জ্যাকেটের বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইস্তাহার জড়ো করা বাক্সটার পাশে সে গা এলিয়ে দাঁড়াল, বসবার মতো কিছু ঘরের ভেতর ছিল না। কালো আর লাল কালিতে আঁকা মূর্তিটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। আর রুট ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের গায়ে।

হঠাৎ একটা বাতির আলো হলদে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কমতে লাগল। এগিয়ে এসে বাতিটার ওপর ঝুঁকে ডিক্ বলল, 'তুমি না বলেছিলে যথেষ্ট তেল আছে। এটা তো দেখছি খালি।'

রুট বলল, 'আমি ভেবেছিলাম যথেষ্ট আছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না। ওই বাতিটায় প্রায় ভর্তি তেল আছে। খানিকটা তেল এই বাতিটায় ঢেলে নিয়েই তো হয়।'

'সেটা কী ভাবে করা যায় বল তো? তেল ঢালতে হলে দুটো বাতিই নিবিয়ে ফেলা দরকার। তোমার কাছে দেশলাইয়ের কাঠি আছে?'

পকেট হাতড়ে রুট বলল, 'মাত্র দুটো।'

'তবেই দেখ। ওই একটা বাতিতেই সভার কাজ চালাতে হবে। আমার উচিত ছিল বিকেলের দিকে একবার ঠিকঠাক করে দেখে নেওয়া। অবিশ্যি তখন আমি শহরে ব্যস্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম এ কাজটুকু তোমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'আচ্ছা, এই বাতিটা থেকে খুব তাড়াতাড়ি খানিকটা তেল পাত্রতে ঢেলে নিয়ে তারপর সেই তেলটা ওই বাতিতে ঢাললেই হয় তো।'

'হ্যাঁ, তারপর আগুন লাগিয়ে একটা কাণ্ড বাধাও আর কি। তোমার মতো লোকের সাহায্য নিতে হলেই হয়েছে!'

রুট আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'এবার ওরা এসে পড়লেই তো হয়! কটা বেজেছে ডিক্?'

'আটটা বেজে পাঁচ মিনিট।'

'তবে কী হলো ওদের? দেরি করছে কেন? আটটার সময় আসতে বলেছিলে তো?

'বাবারে বাবা, থামো তো একটু। জালিয়ে মারবে দেখছি। ওদের কী হয়েছে সেটা আমার জানবার কথা নয়। হয়তো ওদের আসবার ইচ্ছে নেই। খানিকক্ষণ একটু চুপ করে থাকো তো দেখি।' তারপর জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট আছে রুট?'

'না'।

চারদিক নিস্তব্ধ। শহরের যে দিকটা কেন্দ্রস্থল সেখানে মোটর যাতায়াত করছে। ইঞ্জিনের গোঙানি আর মাঝে মাঝে হর্নের শব্দ। কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে একটা কুকুর একঘেয়ে ডেকে চলেছে। বাতাসে লোকাস্ট গাছের পাতায় ঝর ঝর শব্দ।

'শোন ডিক্! গলার স্বর শুনতে পাচ্ছ? বোধ হয় ওরা আসছে।'

দুজনে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল।

'কই, কিছু শুনছি না তো। ওটা তোমার শোনার ভুল।'

একটা নোংরা জানলার কাছে গিয়ে রুট বাইরের দিকে তাকাল। ফিরে এসে একবার দাঁড়াল ইস্তাহারগুলোর সামনে। তারপর আবার সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল সেগুলো।

'কটা বেজেছে ডিক্?'

'থামো তো। পাগল করে ছাড়বে দেখছি। এসব কাজে খানিকটা সাহস দরকার। দোহাই তোমার, একটু সাহসের পরিচয় দাও।'

'তুমি তো জান ডিক্, আমি এর আগে আর কখনো বেরোইনি।'

'একথা তো যে কেউ বলতে পারে। অবিশ্যি তুমি অনেকবারই বলেছ কথাটা।'

দমকা বাতাসে ঝর ঝর শব্দ করে উঠল লোকাস্ট গাছের পাতাগুলো। সামনের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়ে একটা কবাট খুলে গেল আস্তে আস্তে। ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটু। খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকে কোণের স্তূপীকৃত নোংরা খবরের কাগজগুলো ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল, দেওয়ালে আঁটা পোস্টার দুটোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল পর্দার মতো।

'দরজাটা বন্ধ কর রুট···আচ্ছা খোলাই থাক। তাহলে ওদের আসার শব্দটা আরও ভালোভাবে শোনা যাবে।' তারপর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।'

'ওরা আসবে তো? যদি না আসে তো কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করব?'

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বয়স্ক লোকটি বলল, 'অন্তত সাড়ে নটার আগে এই জায়গা ছেড়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। মিটিং করবার জন্যে আমরা এসেছি।'

খোলা জানলা দিয়ে রাত্রির শব্দ আরও স্পষ্টভাবে ভেসে আসছে—

শুকনো পাতার খসখসানি, কুকুরটার একঘেয়ে ডাক। দেওয়ালে আঁটা লাল আর কালো কালিতে আঁকা মূর্তিটা অস্পষ্ট আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে, আর তলার দিকটা খুলে গিয়ে দুলছে বাতাসে। ডিক্ তাকিয়ে রইল সেদিকে। শান্ত স্বরে বলল, 'শোন রূট, আমি জানি তুমি ভয় পেয়েছ। যখনই ভয় হবে ওর দিকে তাকিয়ে দেখো।' আঙুল দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে আবার সে বলল, 'ও কিন্তু ভয় পায় নি। ওর কথাটা মনে রেখো।'

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে রূট বলল, 'তুমি কি মনে কর যে ও কোনোকালেই ভয় পায় নি?'

তীব্র ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ডিক্ ফুঁসে উঠল, 'যদি পেয়েও থাকে তো সেটা কেউ জানতে পারে নি। ওর কাছ থেকে অন্তত এই শিক্ষাটুকু তুমি নিও। এ ভাবে সবার কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করলেও চলবে।'

'তুমি সত্যিই ভারি ভালো লোক, ডিক্। আমাকে যখন একা বেরোতে হবে তখন যে কী করব জানি না।'

'কিচ্ছু ভেব না, তুমি ঠিক পারবে। আমি বলছি পারবে, সে যোগ্যতা আছে তোমার, এখন শুধু দরকার খানিকটা অভিজ্ঞতা।' দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে রূট বলল, 'ওই কে যেন আসছে, শুনতে পাচ্ছ না?'

'আবার সেই কথা! আসবার হলে ঠিকই আসবে।'

'আচ্ছা, দরজাটা বন্ধ করে দিই না। জায়গাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ওই শোন! নিশ্চয়ই কেউ আসছে।'

রাস্তায় দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ক্রমে শব্দটা দ্রুততর হলো, কে যেন দৌড়ে আসছে। লম্বা কোট গায়ে, মাথায় চিত্রকরের টুপি, একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভেতর ঢুকে বলল, 'ভাল চাও তো লম্বা দাও। একদল লোক আসছে হামলা করতে। মিটিংএ কেউ আসছে না। ওরা তো তোমাদের কথা মোটেই ভাবছে না! কিন্তু আমি তা পারলাম না। তাড়াতাড়ি! জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। দলবল এসে পড়ল বলে।'

রূটের মুখটা বিবর্ণ আর কঠিন দেখাল। সন্ত্রস্ত হয়ে সে তাকাল ডিকের দিকে। অন্তজন কেঁপে উঠল, হাত দুটো ঢোকাল বুক-পকেটের ভেতর, কাঁধ ঝুলে পড়ল।

'ধন্যবাদ', সে বলল, 'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি যাও, আমরা ঠিক আছি।'

লোকটা বলল, 'ওরা তো তোমাদের কথা মোটেই ভাবছে না।' মাথা নেড়ে ডিক্ বলল, 'তা তো বটেই। তবে কী জান, ওরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। ওরা অন্ধ। আচ্ছা এবার তুমি পালাও, নইলে ধরা পড়বে।'

'তার মানে তোমরা আসছ না? তোমাদের জিনিসপত্র আমিও কিছু কিছু নিয়ে যেতে পারি।'

শুকনো গলায় ডিক্ বলল, 'আমরা এখানেই থাকব। সেই হুকুমই আছে আমাদের ওপর। হামলা সহ্য করতেই হবে।' লোকটি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বল তো আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি।'

'নাঃ দরকার নেই। হয়ত অন্য কোনো সময়ে তোমার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।'

'আচ্ছা বেশ, আমার যা সাধ্যি আমি করলাম।'

তিন

ডিক্ এবং রূট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল লোকটির পায়ের শব্দ কাঠের গলিটা পার হয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই রাত্রির শব্দ—শুকনো পাতার খসখসানি, দূরে শহরের কেন্দ্রস্থলে মোটরের যাতায়াত।

ডিকের দিকে তাকাল রূট। বুক-পকেটের ভেতরে লোকটির দুই হাত যে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে। মুখের মাংসপেশী টান হয়ে উঠেছে কিন্তু তবুও সে হাসল রূটের দিকে তাকিয়ে। হাওয়ায় পোস্টারটা একবার নড়ে উঠে আবার লেগে রইল দেওয়ালের গায়ে।

'ভয় হচ্ছে, না?'

প্রথমে রূট চেষ্টা করল ভয়ানকভাবে প্রতিবাদ করতে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভয় হচ্ছে, শোনো ডিক্, আমি বোধহয় এ কাজের উপযুক্ত নই।'

হিংস্রভাবে ডিক্ বলল, 'সাবধান রূট! নিজেকে সামলাও!' তারপর ডিক্ কয়েক লাইন উদ্ধৃতি শোনাল: 'যারা সহজেই ভেঙে পড়ে তাদের সামনে দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। অন্যায়কে প্রকাশ করতে হবে.

সাধারণ মানুষের কাছে। মনে আছে তো রুট, এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ।' কথাটা বলে আবার সে চুপ করল। কুকুরটা হঠাৎ জোরে চিৎকার করে ওঠে।

রুট বলল, 'বোধ হয় ওরা আসছে। আচ্ছা ডিক্, ওরা কি আমাদের খুন করে ফেলবে?'

'না, সাধারণত ওরা খুন করে না।'

'কিন্তু ওরা আমাদের ওপর লাথিঘুষি চালাবে তো। লাঠির বাড়ি মারবে মুখের ওপর, নাক ভেঙে দেবে। বড় মাইককে জানি, ওর চোয়াল তিন জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল।'

'সাবধান রুট! নিজেকে সামলাও! আর একটা কথা মনে রেখো। যখন কেউ তোমাকে আঘাত করে, সে আঘাত আসলে সেই লোকটি করছে না, করছে এই সমাজব্যবস্থা। আর আঘাতটা তোমার ওপর নয়, আমাদের আদর্শের ওপর। কথাটা মনে থাকবে তো?'

'ডিক্, পালাতে আমি চাই না। দিব্যি গেলে বলছি। যদি আমি পালাবার চেষ্টা করি, আমাকে ধরে রেখো। রাখবে তো?'

কাছে এগিয়ে এসে রুটের কাঁধে হাত রেখে ডিক বলল, 'আমি বলছি তুমি ঠিক থাকবে। মানুষ চিনি আমি।'

'আচ্ছা, ওই বইগুলো লুকিয়ে ফেললে হয় না? এখানে থাকলে তো ওরা পুড়িয়ে ফেলবে।'

'না—হয় তো ওদেরই মধ্যে কেউ একজন একটা বই পকেটে নিয়ে গিয়ে পরে পড়বে। তাতেও খানিকটা কাজ হবে। বইগুলো ওখানেই থাকুক। আর কথা বলাটা এবার বন্ধ কর। এ সময়ে কথা বলে কোনো লাভ হয় না!

কুকুরটা আবার সেই আগের মতো একঘেয়ে ডাকছে। একটা দমকা বাতাসে কতকগুলো শুকনো পাতা খোলা দরজাটার সামনে এসে পড়ল। ছবিটা উড়ছে, একটা কোণ খুলে গেছে দেওয়াল থেকে। রুট এগিয়ে এসে আবার ঠিকমতো লাগিয়ে দিল ছবিটা। শহরের দিকে কোথায় যেন একটা মোটর ব্রেক কষেছে। 'কিছু শুনতে পাচ্ছ ডিক? কী মনে হয়, ওরা আসছে?'

'না।'

'জান ডিক্, বড় মাইক ভাঙা চোয়াল নিয়ে দু-দিন পড়েছিল, তারপরে লোকজন ওকে তুলে নিয়ে আসে।'

বয়স্ক লোকটি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল। একটা মুষ্টিবদ্ধ হাত বেরিয়ে এল জ্যাকেটের পকেট থেকে। রুটের দিকে তাকিয়ে ঘোঁচ হয়ে গেল চোখ দুটো। তারপর হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'মন দিয়ে শোন, একটা কথা বলি। আমি নিজেও বিশেষ কিচ্ছু জানি না। কিন্তু এ ধরনের পরীক্ষা আমার ওপর আগেও হয়েছে। একটা কথা আমি খুব জোর গলায় বলতে পারি, সত্যিই যখন আঘাত আসে তখন তা কাবু করতে পারে না। কেন পারে না আমি জানি না, কিন্তু পারে না। যদি ওরা তোমাকে খুন করেও ফেলে তাহলেও টের পাবে না।' কথাটা বলে সে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, এদিক ওদিক তাকিয়ে কান পেতে শুনল, তারপর আবার ফিরে এল ঘরের ভেতর।

'কিছু শুনতে পেলে?'

'না, কিছু না।'

'কেন ওরা আসছে না বলতে পার?'

'আমি কি করে জানব বল?'

একবার ঢোঁক গিলে রুট বলল, 'হয় তো ওরা আসবে না। হয় তো ওই লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে, এমনি একটু ঠাট্টা করে গেল আর কি।'

'হতেও পারে।'

'আচ্ছা, আমরা সারারাত অপেক্ষা করব নাকি যাতে ওরা এখানে এসে আমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে!'

ডিক্ ভেংচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, সারারাত অপেক্ষা করব যাতে ওরা এসে আমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে।'

একটা দমকা হাওয়া হিংস্রভাবে আছড়ে পড়ল, তারপরেই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কুকুরটার চিৎকার থেমে গেছে। ক্রশিং-এর মুখে একটা ট্রেনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে ট্রেন চলে যেতেই রাত্রিটা আগের চেয়েও নিস্তব্ধ মনে হলো। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে ঘড়ির এ্যালার্ম বাজছে। ডিক্ বলল, 'কাকে যেন এর মধ্যেই কাজে বেরোতে হবে। বোধ হয় রাতের পাহারাওলা।'

'কটা বেজেছে ডিক?'

'সোয়া নটা।'

'কী কাণ্ড! মাত্র সোয়া নটা। আমি ভেবেছিলাম ভোর হতে চলেছে।

ওরা এসে যা করবার করে গেলেই তো পারে, কি বল ডিক্ ? ওই শোন। পায়ের শব্দ, না ?'

দুজনে কান পেতে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেরই মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'গলার স্বর শুনতে পাচ্ছ ডিক্ ?'

'তাই মনে হচ্ছে। খুব চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে বোধ হয়।'

কুকুরটা আবার ডেকে উঠল। এবারের ডাকটা খুবই হিংস্র। অনেক লোকের কথাবার্তার অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। রুট বলল, 'দেখ ডিক্, পেছনকার ওই জানলার ওপাশে কাকে যেন দেখলাম বলে মনে হলো।'

বয়স্ক লোকটি অস্বস্তিভরা মুখভঙ্গি করে বলল, 'তাহলে আর আমাদের পালাবার উপায় নেই। জায়গাটা ওরা ঘেরাও করেছে। নিজেকে সামলাও রুট। এবার ওরা আসছে। মনে রেখো, ওরা নয়, সমাজব্যবস্থা।'

তারপরেই অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। সশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকল একদল লোক—অগোছাল বেশভূষা, মাথায় কালো টুপি, হাতে ডাণ্ডা আর লাঠি। ডিক এবং রুট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—উদ্ধত চিবুক ; চোখের দৃষ্টি নামানো, প্রায় বোজা। ভেতরে ঢুকে এসে হামলা-কারীরা অস্বস্তি বোধ করছে। দুজনের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সকলে, ভুরু কোঁচকানো, সকলেই অপেক্ষা করছে কেউ কিছু একটা করুক।

ডিকের দিকে আড়চোখে তাকালো রুট। ডিক তাকিয়ে আছে তার দিকে, মুখে কোনো রকম ভাবের প্রকাশ নেই, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কম্পিত হাত-দুটো পকেটের আড়ালে রেখে একরকম জোর করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল রুট। ভয়ে গলাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, চিৎকার করে সে বলে চলল, 'কমরেড্‌স্, আমাদের মতোই মানুষ তোমরা। আমরা ভাই ভাই'—ভারি শব্দ তুলে একটা ডাণ্ডার বাড়ি এসে পড়ল তার মাথার একপাশে। হাঁটু চেপে বসে পড়ল রুট ; তারপর হাতের ওপর ভর দিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল লোকগুলো।

আস্তে আস্তে দুই পায়ে রুট আবার উঠে দাঁড়াল। কানের পাশটা কেটে গেছে, রক্তের স্রোত ফিনকি দিয়ে নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে। মুখের একদিক লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আবার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল—চোখে মুখে আবেগ ফুটে উঠেছে, হাত দুটো আর কাঁপছে না, গলার স্বর জোরালো ও প্রখর, দুই চোখে দারুন এক উত্তেজনা।

চিৎকার করে সে বলল, 'তোমরা কি দেখতে পাওনা ? এ সব তোমাদের জন্যেই, তোমাদের জন্যেই একাজে আমরা নেমেছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা কী করছ, তা তোমরা জান না !'

'খতম করো এই লাল ইঁদুরগুলোকে।'

কে যেন পাগলের মতো অনর্গল হেসে উঠল। আর তারপর এল সেই ঢেউ। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে রুটের চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে ডিকের মুখটা ভেসে উঠল। চাপা আর কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠেছে ডিকের মুখে।

চার

কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে সে নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করল। ডিকের গলা ভেসে এল পাশ থেকে।

'জেগেছ নাকি ?'

কথা বলবার চেষ্টা করে রুট বুঝতে পারল, গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে আসছে। বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওরা কিন্তু তোমার মাথাটা তাক করেছিল বেশ ভালোভাবেই। আমি তো তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তখন নাক সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলে সেটা মিথ্যে হয় নি, ওটা আর কোনোদিন ভালো হবে না।'

'আচ্ছা ডিক তোমাকে কী করেছিল ওরা ?'

'ও, একটা হাত আর পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙে দিয়েছে। শোনো, একটা জিনিস তোমাকে শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে কিভাবে মাটিতে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। ওতে চোখদুটো বাঁচে।' একটু থেমে খুব সাবধানে একবার নিশ্বাস নিয়ে আবার বলল, 'পাঁজরার হাড় ভেঙে গেলে নিশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হয়। আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে। পুলিশ আমাদের তুলে নিয়ে এসেছে।'

'তা হলে ডিক্ আমরা কি এখন জেলের ভেতরে আছি নাকি ?'

'হ্যাঁ। জেল হাসপাতালে।'

'আমাদের নামে কী লিখেছে ওরা ?'

ক্লট শুনতে পেল হেসে উঠতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে ডিক্ টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছে। ডিক্ বলল, 'দাঙ্গার উত্তেজনা সৃষ্টি। মাস ছয়েক জেল হবে বোধ হয়। সেই বইগুলো পুলিশের হাতে পড়েছে।'

'শোন ডিক, তুমি ওদের বোলো না কিন্তু যে আমি এখনো নাবালক।'

'না বলব না। তুমি বরং কথা বলা বন্ধ কর। তোমার গলার স্বরটা কেমন মিইয়ে গেছে। ভয় পেও না, ব্যাপারটা সহজভাবে নাও।'

ক্লট চুপ করে রইল। কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার সে কথা বলল, 'জান ডিক্, আমার একটুও ব্যথা লাগেনি। ভারি অদ্ভুত। আগাগোড়া আমি দাঁড়িয়েছিলাম—কিছু বুঝতে পারি নি।'

'শোন ক্লট, তুমি চমৎকার কাজ করেছ। আমি যতো লোককে দেখেছি তাদের কারও চেয়ে কম নয়। কমিটিতে আমি তোমার নাম করব। সত্যি চমৎকার কাজ করেছ তুমি।'

ক্লট প্রাণপণে চেষ্টা করল একটা কিছু মনে করতে, তারপর বলল, 'ওরা যখন আমাকে মারছিল, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমি গ্রাহ্য করি না।'

'ঠিকই তো। তোমাকে আমি এই কথাই বলেছিলাম। আসলে ওরা কিছু নয়, আমাদের দেখতে হবে সমাজব্যবস্থাকে। ওদের ওপর কোনো ঘৃণা আমাদের নেই—ওরা এখনো কিছু জানে না।'

জড়ানো গলায় ক্লট কথা বলল—যন্ত্রণাটা আচ্ছন্ন করেছে তাকে—'তোমার মনে আছে ডিক্, বাইবেলে এক জায়গায় আছে ওদের ক্ষমা কোরো, ওরা জানে না ওরা কী করছে।'

কঠোর স্বরে ডিক্ জবাব দিল, 'ও সব ধর্মের বুলি ছেড়ে দাও ক্লট।' তারপর সে উদ্ধৃতি দিল, 'জনসাধারণকে নেশাচ্ছন্ন করবার আফিম হচ্ছে ধর্ম।'

ক্লট বলল, 'নিশ্চয়ই, আমি জানি। কিন্তু আমি তো ধর্মের কথা বলি নি। ঠিক এই কথাটা আমার তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। তখন ঠিক এই রকমই মনের ভাব হয়েছিল আমার।'

প্রবীণদের কর্তব্য

গালিনা উলানোভা

আমাদের তরুণরা তাঁদের ক্ষমতা প্রকাশের অবাধ সুযোগ ও অধিকার উপভোগ করে থাকেন। নতুন গুণীদের উদ্ভবে পার্টি আজ আগের চেয়েও বেশি যত্নশীল।

অভিজ্ঞতা ও কাজ সত্ত্বেও যদি প্রবীণেরা পিছিয়ে পড়েন, নতুনের চেতনা হারিয়ে ফেলে তাঁরা যদি আমাদের যুগোপযোগী উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পারেন তবে তাঁদের উচিত হবে নবীনদের পথ ছেড়ে দেওয়া—প্রবীণ ও তরুণদের মিলিত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ক্রুশভের এই উক্তি খুবই যথার্থ।

তরুণদের স্মরণ রাখতে হবে যে অধিকারের সঙ্গে সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্বও তাঁদের আছে। কর্তব্যের সচেতনতা, বিবেকের নির্দেশ তাঁদের জীবনে যেন গৌণ না হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ আমি প্রবীণদের কর্তব্যের বিষয়েই কিছু বলা দরকার মনে করছি। একথা বলা প্রয়োজন যে তরুণদের সৃজনশীল কাজের প্রগতিমূলক তাৎপর্য আমরা সর্বদা দেখি না।

তাদের কাজে অন্বেষণ, অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি এবং প্রাপ্তি সমেত বিকাশের যে প্রক্রিয়াটি রূপ নেয় আমরা অনেক সময়ই তার প্রতি অন্ধ থাকি।

ভ্রান্তিটা ততো বড় কথা নয়, প্রাপ্তিটা কিন্তু ফলপ্রসূ। মহান ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যখন আসে তখন শিল্পকে তারা এগিয়েই নিয়ে যায়।

বাহান্ন বছর বয়স্কা প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী গালিনা উলানোভার এই লেখাটি বেরোয় এ বছরের জুন মাসে ইজভেস্তিয়া পত্রিকায়। অনুবাদের সময় কয়েকটি পংক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে—তাতে প্রধানত কয়েকজন ব্যালেশিল্পীর নাম, কয়েকটি ব্যালে ও সঙ্গীতের কথা ছিল। মূল বক্তব্য ও বিষয়ের কোনোই বদল তাতে হয় নি।

উলানোভা তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত ব্যালের কথা বললেও তাঁর মত সাহিত্য, শিল্প, নাট্য ও সঙ্গীতের জগতেও সাড়া তুলেছে।

একেক সময় আমরা তাড়াহুড়ো করে বলে বসি—নতুন শিল্পী ভুল পথ নিয়েছেন। আসলে কিন্তু শিল্পী তখনো তাঁর পথে পা ফেলেন নি। তিনি তখন কেবল প্রচেষ্টায় রত। কেবলমাত্র শুরু করেছেন। আর তাঁর পথটি, মোটেই সুগম নয়।

আমাদের কর্তব্য, তাঁর পথে সৃজন-বিমুখ কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি নয়, তার উল্টোটা। শিল্পে যারা নবাগত তাদের জন্য সবচেয়ে অনুকূল অবস্থাই আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

তা বলে হট-হাউসের পরিবেশ নয়। সহজ স্বাভাবিক অনুকূল কার্যোপযোগী পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেকেরই গুণ প্রকাশ পাবে এবং তা স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পাবে।

আমাদের সব প্রয়াস এই কাজেই যুক্ত হওয়া চাই। আসলে আমাদের সবার অন্বেষণের লক্ষ্য এক। "দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব" (antagonism of generations) আমাদের নেই। তা থাকতেও পারে না।

কিন্তু তবু কখনো কখনো তরুণদের পথে গুরুতর বাধা দেখতে পাই। কেন ?

হয়তো প্রবীণরা যথেষ্ট সহনশীল নন। নিজেদের সাফল্যের মোহে—সে সাফল্য কখনো প্রকৃত, কখনো কল্পিত—আমরা নিজেদের ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে বলে মনে করি।

কিন্তু আমরা এখন জেনেছি কেউই ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া তরুণরা যদি তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চায়, আমাদের ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, জীবনে যে নতুন স্বতঃস্পষ্ট অথচ শিল্পে যাকে ধরা কঠিন তাকেই ধরতে যায়—তবে আমাদের দুঃখ না করে আনন্দ করাই চাই।

একথা মানতেই হবে যে নতুনের চেতনা, নতুনকে জানার বিশেষ ক্ষমতা প্রায়ই আমাদের তুলনায় তরুণদের মধ্যেই বেশি প্রতীয়মান।

শিল্পে তরুণ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ও প্রকাশে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আসলে তারাই হলো আমাদের উত্তরসূরী, তারাই তো সোভিয়েত-যৌবন।

তরুণরা তাদের কাজের দ্বারা আমাদের জীবনধারা ও তার ভিতটিকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

নবাগত যে সে তার তরুণবয়সবশত সোভিয়েত পরিবেশেই শিল্পী হয়ে

উঠেছে। এই পরিবেশটিতে সে অবশ্যই অনুরক্ত।* আমাদের মর্মের (spirit) বিপরীত বা আমাদের মহান উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু সে কখনো সৃষ্টি করতে পারে না।

সেইজন্যই যারা অনুসন্ধানী, অন্বেষী—হয়তো তারা মাঝে মাঝে ভুল করে, কিন্তু তবু যৌবনের প্রশংসনীয় জেদ নিয়ে সোভিয়েত শিল্পে তারা নিজেদের পথ খুঁজে নিতে চায়—তাদের বিরুদ্ধে নালিশ আমার কাছে, খুব কম করেই বলছি, অদ্ভুত ঠেকে।

তাদের এই পথ এখনো সম্পূর্ণ রূপ নেয় নি। কিন্তু সে পথ যে নিয়েছে সে কখনোই মনে করে না যে তারটাই একমাত্র ঠিক পথ, সে যা আবিষ্কার করেছে সেটাই 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' এবং সবার পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য।

সেটা খুবই ভালো। কারণ তার ফলে অনেক নতুন আবিষ্কার, অনেক কৌতূহলজনক সুতরাং তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

লেবেল আঁটার কাজটা খুবই সহজ। যেমন ইগর বেল্‌স্কি এবস্ট্রাক্টবাদে ভুগছেন, ইউরি গ্রিগরোভিচ মডার্নিস্ট কথাটা বলে দিলেই হলো।

যে ক্ষেত্রটি আমার সুপরিচিত সেই ব্যালের নিদর্শনই দিচ্ছি। বলছি কোরিয়োগ্রাফারদের কথা যাঁরা সবে এ কাজে হাত দিয়েছেন।

একথাও বলি বেল্‌স্কি আর গ্রিগরোভিচ আজ আর একা নন। এবং আমার মতে সেটা সৌভাগ্যের কথা।

তাঁরা একা নন কারণ আমাদের দেশে কেউই, বিশেষ করে যিনি গুণী, কখনোই একা পড়ে থাকতে পারেন না। যৌথতা (collectivism) এবং কমরেডশিপ হলো সোভিয়েত চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁরা একা নন। আমাদের কোরিয়োগ্রাফির ক্ষেত্রে এখন দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ক্ষমতার বহু শিল্পী, বহু নতুন নাম।

'মডার্ন' কথাটা ভালো। তার আক্ষরিক মানে হলো—সবচেয়ে হালের, সমসাময়িক, আজকের।

কেবল পরোক্ষ অর্থেই তা নেতিবাচক, এমন কি অপবাদের মতো শোনায়—যখন তার দ্বারা অত্যধিক পরিশীলিত অস্বাভাবিক বুর্জোয়া শিল্পের কথা বোঝানো হয়।

আমাদের কোরিয়োগ্রাফারদের বেলায় এই অর্থ প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কথাটার আক্ষরিক অর্থেরই নিকটবর্তী।

"মডার্ননিজম"[১] ব্যালের ঐতিহ্যগত সাজের অভাবে নেই, রয়েছে অর্থ, আইডিয়া এবং অনুভূতির অভাবে।

বাইরের 'পোশাকের' লক্ষণে কিছুই প্রকাশ পায় না।

প্রকাশ পায় আইডিয়ায়, বিষয়ে (content), প্রকাশ পায় নাচে। আবেগ ও চিন্তার অন্তস্থ গুণটি ফোটানোয় কোরিয়োগ্রাফারের ক্ষমতা।

বেল্‌স্কির "সুখের তীর" বা শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত সুরকারদের সিমফনিক সঙ্গীতকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা আমার মোটেই এব্‌স্ট্রাকশনিজম বলে মনে হয় নি। এ হলো সমসাময়িক মানুষের অনুভূতিকে অত্যন্ত সাধারণীকৃত (generalised) কিন্তু সম্পূর্ণ সুতরাং প্রত্যয়যোগ্য ভাবে প্রকাশের প্রয়াস। বেল্‌স্কি চাইছেন নৃত্যের প্রচলিত রীতিতে অনুভূতির বাস্তবতা ফোটাতে। তাতে সফলও হচ্ছেন, যদিও সব সময় নয়।

গ্রিগরোভিচের 'পাথরের ফুল' এবং 'প্রেমের কাহিনী' ব্যালে দুটির "বিষয় আধুনিক নয়।" কিন্তু তারা রচিত হয়েছে আধুনিক মানুষের দ্বারা এবং হাল আমলের সঙ্গীতের সাহায্যে।

'মডার্ন' কথাটির সব অর্থই তাতে রূপ পেয়েছে। সেটা ভালো কি মন্দ? আমার মতে ভালো। তার কারণ কোরিয়োগ্রাফার যা খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকটাই চিন্তাসমৃদ্ধ, তাতে প্রাণ আছে।

অবশ্যই যে অন্বেষণে স্নব্‌পনা (snobbishness) নেই, যা শুধু নতুন কিছু করার উদ্দেশেই কিছু একটা খুঁজে বের করা নয়—তাকেই আমরা সমর্থন করি।

সেইজন্যই আমি ফলপ্রসূ পরীক্ষার পক্ষে, তরুণদের পুরোপুরি প্রকাশের সুযোগ দেবার পক্ষে। যদি তারা তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে না করে, যদি তাদের 'ছোঁয়াচ'[২] লাগে, তবুও।

কারণ সেটাও যৌবনের পক্ষে স্বাভাবিক। তরুণদের সব কিছুর মধ্যে দিয়েই যেতে দেওয়া হোক। আমাদের প্রবীণ কমরেডরা এবং আমরাও যেমন গিয়েছি ক্লাসিকসকে নস্যাৎকারী বিদ্রোহ এবং এক্রোবেটিক্‌স্‌-এ উৎসাহের মধ্যে দিয়ে। কালের গতিতে, জীবন ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই আমরা আতিশয্যকে বাদ দিয়েছি। এই সব আতিশয্যও অবশ্য কিছু ফল দেয়। যেমন দ্বৈতনাচের[৩] ঘটায় অসাধারণ ব্যাপ্তি। সৃষ্টি করেছে নতুন জাতের নাচিয়ে, নতুন ধরনের ব্যালে-নায়ক।

তার উদ্ভব জীবন থেকেই। নতুন কাল জীবনে ও মঞ্চে মেয়েলী স্বভাবের তীরু তরুণদের বাতিল করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত করে বলিষ্ঠপ্রকৃতি বিপ্লবী মানুষের সাহস, স্বচ্ছতা আর সৌন্দর্য।

রঙ্গমঞ্চে তার প্রতিমূর্তি গড়ে ওঠে। দেখা দেয় নতুন ব্যালে। তা হলো নাট্য ও নৃত্যের সমন্বয়।

নাট্যের প্রতি অতি উৎসাহবশে ব্যালের প্রধান প্রকাশমাধ্যম যে নাচ তাকেই ত্যাগ করার বিপদও তখন দেখা দেয়।

বাস্তবতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলে ঠিক উল্টো ফলই আমরা তখন পাই। কখনো কখনো আবশ্যিক এবং মনোহারী রীতি, ব্যালেশিল্পের সাধারণ প্রকৃতিকেই বিসর্জন দেওয়া হয় নেচারালিজমের কাছে।

সেটা খারাপই হয়েছিল। এবং তার প্রতিবাদও দেখা দেয়।

তরুণরা চায় তাদের কালের ছন্দ ও ভঙ্গি ধরতে: উত্তেজিত ছন্দ, কখনো কখনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কৌণিক ভঙ্গি।

সে সময়ে ভালো যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং এখন যা খুঁজে বের করা হচ্ছে—তারা লুপ্ত হবে না, বিকাশ পাবে। যা অতিরিক্ত, মূল ছাড়া, তা খসে পড়বে, বিস্মৃত হবে।

সব মহা শিল্পীই নতুনের সন্ধানে দুর্গম কিন্তু নিজস্ব পথ বেয়ে এগোন জ্ঞানের দিকে। এই উপলব্ধির দিকে যে প্রকৃত শিল্প সর্বদাই সরল, সহজ এবং গভীর মানবিকতায় ভরা। আর তা সর্বদাই আধুনিক।

সেটাই আমাদের কালের প্রয়োজন, আমাদের যুগের মর্মের উপযোগী।

তাই যা কিছু নতুন ও প্রগতিশীল তাদের সমর্থন করাটা দরকার।

সেই কারণেই আমাদের রয়েছে বিরাট দায়িত্ব, সোভিয়েত শিল্পের ভবিষ্যৎ যে তরুণরা তাদের ভাগ্যের প্রতি প্রবীণদের দায়িত্ব।

প্রশংসা ও নিন্দার প্রথম কথাটা তরুণরা আমাদের কাছ থেকেই শুনতে চায়।

প্রকৃত গুণী যাঁরা তাঁরা সৃজনশীল জীবনে নিজেদের স্থান পাবেন কিনা, আত্মিক মূল্য সৃজনে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁরা সক্ষম হবেন কিনা, তা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর।

প্রবীণদের কর্তব্য হলো তরুণদের সঙ্গে মিলে ক্লাসিকাল নৃত্যরীতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে বাঁচিয়ে রাখা, তা না হলে নাচের বিশুদ্ধ রূপ লোপ পাবে। সেই

সঙ্গে, যে নৃত্যধারা সংরক্ষণযোগ্য ভবিষ্যতের জন্য তাকে রক্ষা করা, তার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটানো। যাতে ক্লাসিসিজমের সমৃদ্ধ ভূমিতে নতুন কিছু গড়ে উঠতে পারে।

প্রবীণদের কর্তব্য হলো তরুণদের সাহায্য করা। তাদের সঙ্গে মিশে নতুন বিষয় খোঁজা। নতুন রূপ ও নতুন ভাবের অন্বেষণে তরুণদের নির্ভয়ে সমর্থন করা।

তরুণদের গুণের সহায়তা করলে পরই আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য সাধন করতে পারব—আমাদের কালের নায়কদের নিয়ে ব্যালে রচনা।

অনুবাদ : শুভময় ঘোষ

১। "নিন্দার্থে"—অনুবাদক

২। বিদেশের প্রভাবের কথাই বোধহয় বলা হচ্ছে—অনুবাদক

৩। Pas de deux

বাংলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

নীরেনবাবু তাঁর ২৫শে জুন তারিখের চিঠিতে আমার অনুবাদপদ্ধতির উপরই অন্যায় রূপে আক্রমণ করেছেন, তাই উত্তর দিতে বাধ্য হলুম। আমি আমার ৫ই জুন তারিখের চিঠিতে পরিষ্কার দেখিয়েছি, কবিবর শেলীর ও আমার অনুবাদপদ্ধতি এক। আমার এই উক্তি উনি খণ্ডন করেন নি, কিন্তু শেলীকে আক্রমণ করার সাহস ওঁর হলো না, করলেন আমাকে।

তবে উনি একটি কথা ঠিকই লিখেছেন যে আমি জার্মান্ প্রায় মাতৃভাষার সমানই জানি। তাই সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই রাফায়েলে'র উক্তিটির মূল উদ্ধৃত করে, তার অন্বয় ও অবিকল অনুবাদ গদ্যে দিচ্ছি :

মূল

Die Sonne toent nach alter Weise
In Brudersphaeren Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Staerke,
Wenn keiner sie ergruenden mag ;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.

অন্বয়

১। Die Sonne [সূর্য] toent ['ধ্বনি করছে,' 'গান করছে'-ও হয়, ফাউস্তের উপর জার্মান্ টিকা ও সাহিত্যের অনুসারে 'ধ্বনি করছে' এখানে প্রযোজ্য]

nach alter Weise [পূর্বের মতন]

২। In Brudersphaeren [ভ্রাতাদের মণ্ডলে]

Wettgesang [গানের দ্বন্দ্ব],

৩। Und [এবং] ihre [তাহার অর্থাৎ সূর্যের]
Vorgeschriebne [পূর্ববিহিত] Reise [ভ্রমণ, এখানে বিশ্বভ্রমণ]

৪। Vollendet [সমাপ্ত করছে] sie [সে অর্থাৎ সূর্য]
mit [সহিত] Donnergang. [বজ্রের গতি]।

৫। Ihr [ইহার] Anblick [দর্শন] gibt [দেয়]
den Engeln [দেবদূতদিগকে] Staerke [বল বা শক্তি],

৬। Wenn ['যখন' এখানে 'যদিও'] keiner. [কেহই নয়] sie
ergruenden [ইহার রহস্য বা তত্ত্ব বুঝতে বা তার অন্তরে প্রবেশ করতে] mag ; [পারে] ;

৭। Die unbegreiflich [কল্পনাতীত] hohen [উচ্চ বা মহান]
Werke ['কর্মসমূহ' এখানে 'সৃষ্টিসমূহ']

৮। Sind [হয়] herrlich [অপূর্ব বা বিস্ময়কর] wie [যেমন]
am ersten Tag. [প্রথম দিনে]।

গদ্যে অনুবাদ

সূর্য পূর্বেরই মতন ভ্রাতাদের মণ্ডলে গানের দ্বন্দ্বে ধ্বনি করছে আর বজ্রের গতিতে তার পূর্ববিহিত বিশ্বভ্রমণ সমাপ্ত করছে। এই দৃশ্য দেখে দেবদূতগণ বলবান হচ্ছে যদিও কেহই ইহার তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তোমার কল্পনাতীত মহান সৃষ্টিসমূহ আজও তেমনি অপূর্ব বা বিস্ময়কর যেমন প্রথম দিনে ছিল।

আমার অনুবাদের প্রথম ছত্রটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম শব্দে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনলে সেটা দাঁড়ায় এই :

ভ্রাতৃমণ্ডলে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনিগতিতে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান।
কল্পনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান।

ইহা অবিকল ও প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ, যদিও আমি দাবি করি না যে আমি আক্ষরিক অনুবাদ করি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে আশা করছি, প্রথম ছত্রটাও থাকবে, কাজেই তাতে প্রথম দুই ছত্র হবে এই :

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ—
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন

প্রথম ছত্রটি লিখলুম কেন? কারণ শুধু "ভ্রাতৃমণ্ডলে" লিখলে অনেক বাঙালীর ধারণা হতে পারে এর অর্থ বুঝি, সূর্য ধ্বনি করতে করতে গ্রহমণ্ডলেই ঘুরছে, কারণ আমাদের কাছে সূর্য নবগ্রহের একটি গ্রহ, "ভ্রাতৃসম মহা-জ্যোতিষ্কগণ" বলায় তৎক্ষণাৎ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ও অসংখ্য জ্যোতিষ্ক তারাগুলির সুবিশাল দৃশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ও তার সুসংগতির শান্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অথচ "তারা" বা "তারাদল" শব্দটা ব্যবহার করতে হলো না, যা মহাকবি গ্যোতে স্বয়ং ব্যবহার করেন নি। তাঁর বিশ্বপ্রেমিক হৃদয় পশু, পক্ষী, মৎস্যকেও মনুষ্যের এবং মহাকাশের সকল তারাকে সহধর্মী সূর্যের ভ্রাতা জ্ঞান করত। এই বিরাট কল্পনার শান্তভাবের রসটা নষ্ট হয়ে যায় যদি শুধু "তারা" কথাটা ব্যবহার করি, যা প্রথমে করেছিলাম। তাই সে কবিতা বর্জন করে এই কবিতা রচনা করেছি, কিন্তু নীরেনবাবু এই দুই রচনার প্রভেদ বুঝতে পারলেন না, উনি শুধু আমার প্রতি শ্লেষবাক্য নিক্ষেপ করলেন।

আমার সমস্ত অনুবাদকাব্যই এইরূপে মূলতঃ আক্ষরিক অনুবাদ। শুধু যেখানে যেখানে বাঙালীর জন্যে অন্তর্নিহিত ভাব রস ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন বোধ করেছি সেই সেই স্থলে অতিরিক্ত যথাযথ শব্দ ব্যবহার করে এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়েছি বা পদটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছি, কিন্তু মূলের ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে যেমন উপরে করেছি। এর ফলে বাংলা ফাউস্ত সকল শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সহজবোধ্য হয়ে গেছে। নীরেনবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ফাউস্ত' কঠিন নাট্যকাব্য আর ইহাও অবিদিত নয় যে গ্যোতের ফাউস্ত ভালো করে বোঝা এমন কি সাধারণ জার্মানের পক্ষেও কঠিন। বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি, তাঁরা 'ফাউস্তে'র ইংরাজি অনুবাদ পড়ে ভালো বুঝতে পারেন নি। আমি এই কঠিন জার্মান নাট্যকাব্য, যা বিশ্বসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন, সহজ, সরল,

সরস বাঙলা ছন্দে সর্বপ্রথম বাঙালীকে পরিবেশন করেছি। ইতিমধ্যেই বাঙলার বহু সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলির আলোচনায় ও বহু সুধীজনের মন্তব্যে বুঝেছি এর ছন্দ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অনেকের মতে ইহা বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পদ হয়েছে, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মহাশয়, যিনি জার্মান ভালো জানেন, মূলের সঙ্গে তুলনা করে এটি অধ্যয়ন করে অযাচিতভাবে আমাকে একপত্রে এর উচ্চপ্রশংসা করেছেন ও বলেছেন বঙ্গভাষীমাত্রেরই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে আমি সর্বপ্রথম 'গ্যোতে'র শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসাস্বাদন করা বাঙালীর পক্ষে সম্ভব করেছি। আর নীরেনবাবু এই বহুজন প্রশংসিত প্রায় তিনশত পাতার নাট্যকাব্যের মাত্র দুটি ক্ষুদ্র কবিতা (তার মধ্যে মাত্র একটি গীতিকবিতা, অপরটি নয়) বেছে নিয়ে, তার শুধু "গ্রন্থনমিল" ঠিক গ্যোতের মতন হয় নি বলে আমার অনুবাদপদ্ধতিই আক্রমণ করে এর মুণ্ডপাত করতে উদ্যত হয়েছেন। এরই নাম সমালোচনা?

আমি ভূমিকাতেই স্পষ্ট লিখেছি, যা নীরেনবাবু স্বীকার করেছেন, আমি 'গ্যোতে'র ছন্দও অনুকরণ করার চেষ্টা করি নি, কারণ আমি জানতুম তাতে করে আমার ছন্দ তো আড়ষ্ট হতোই, সেটা না হতো গ্যোতের ছন্দ, না বাঙলা ছন্দ। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ভাষার মহাকবির ছন্দও অনুকরণ করার চেষ্টার লোভ সম্বরণ করেছি বলেই আমার ছন্দ সরল, সরস, স্বচ্ছন্দপ্রবাহ ও অনুবাদগন্ধশূন্য হয়েছে। কিন্তু মূলের ধ্বনি আমার কানে সব সময়ে ছিল বলে বহুস্থানে ধ্বনির আশ্চর্য মিল হয়েছে, যে কথার উল্লেখ তাঁর উপক্রমণিকায় সুনীতিবাবু করেছেন, আর গীতিকবিতাগুলির শুধু ধ্বনিতে মিল হয় নি, ছন্দ গঠনেও বহুলাংশে স্বতঃই মিল হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল কোনো বাহাদুরী বা নামযশ কেনা নয়, বাঙালীর চিরাভ্যস্ত ছন্দে মূল ফাউস্ত বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করে এর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, বাঙালী একে সাদরে গ্রহণ করেছে, তাই এর দ্বিতীয় সংস্করণও এত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হবে, যাতে আশা করি প্রথম সংস্করণের সকল রকম দোষত্রুটি বিদূরিত হবে। এই সংস্করণেই আমি গ্যোতের কত নিকটে এসেছি তা বোঝার ক্ষমতা নীরেনবাবুর নেই, কারণ উনি নিজেই স্বীকার করেছেন, বহুকাল পূর্বে অর্জিত ওঁর সামান্য জার্মান জ্ঞানও আজ মরচে ধরে গেছে, কাজেই উনি চৈত্রের পরিচয়ে ঠিকই লিখেছেন, "কানাইবাবুর এই অনুবাদ সমগ্রভাবে জার্মানের সহিত মিলাইয়া

পড়িবার যোগ্যতা আমার নেই।" হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের এ যোগ্যতা আছে, তিনি কী বলেছেন তা উপরেই উল্লেখ করেছি। আর সম্প্রতি অযাচিত ভাবে পূর্ব জার্মেনীর সমাজবাদী সরকার এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, তাঁদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তাঁরা জেনেছেন আমার অনুবাদ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে। ইহা সুবিদিত, জার্মান বিশেষজ্ঞ মানে তিনি মাতৃভাষা তো বটেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও ভালো রকম বোঝেন। সুতরাং এ থেকে আমি নিশ্চিত হতে পারি আমার অনুবাদপদ্ধতি যথার্থই সমুচিত।

আমি সম্যকরূপে অবহিত, চণ্ডীদাস হতে কাজি নজ্‌রুল অবধি বাঙলার বরেণ্য কবিগণের বিপুল সাধনার ফলে, বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপ্রমেয় অবদানের ফলে, বাঙলার কাব্যভাণ্ডার ইংরাজি বা জার্মান কাব্য ভাণ্ডারের সমতুল্য। ইহা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ যে বাঙলায় সাবলীল ছন্দ লেখার সম্ভাবনায় আমার আস্থা কম, তাহলে এত সুধীজনের অভিমতে আমি প্রায় তিনশ পাতার সাবলীল ছন্দ লিখলুম কি করে?

বাঙলার এইসব বরণীয় কবিদের অজস্র কাব্যসুধাধারার বর্ষণের ফলে বাঙলার কাব্যসাহিত্যের উর্বর ভূমিতে বহু বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আর এর প্রত্যেকটি ছন্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতা রচনা করেছেন, শুধু তাই নয় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বহু নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেছে। তাই আজ বঙ্গভাষার সকল প্রকার কবিতার ছন্দ, হোক তা গদ্যপদ্য বা ছন্দবদ্ধ পদ্য, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় আর প্রতি শ্রেণীর সাধারণ নিয়ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে, আর সেই পুস্তক পথপ্রদর্শক হয়েছে। এখন বাংলা ছন্দের ওপর কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি কেউ কী অনুবাদের ক্ষেত্রে, কী স্বকীয় রচনার ক্ষেত্রে কবিতা লিখতে চান তো এইসব নিয়মের সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তবে যদি তিনি চেষ্টা করেন, আর ছন্দ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তবেই তা হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল হবে। এই উপায়ে কবিতা রচনা করাকেই আমি "খাঁটি বাংলা পদ্ধতি" বলি, আর এইরূপে রচিত ছন্দকে "খাঁটি বাংলা ছন্দ" বলি।

এ অতি সহজ কথা। কিন্তু নীরেনবাবু লিখেছেন, "খাঁটি বাঙলা পদ্ধতি বলিতে, কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে, তিনি (অর্থাৎ আমি) কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমার (অর্থাৎ নীরেনবাবুর) বুদ্ধির অগম্য।" তা তো বটেই! তাই তিনি

বাঙলায় ছন্দ গঠনের নিয়ম উপেক্ষা করে, গ্যোতের ছন্দ নাকি অনুকরণ করে, রাফাএলের এক অনুবাদ-কবিতা লিখে ফেলেছেন ও তাহা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত করেছেন। সেটি হলো এই :

গাহিছেন সূর্যদেব, সনাতন সংক্রমণে,
প্রতিদ্বন্দ্বী তারাদলে সদর্প সঙ্গীত,
সমাপিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত আবর্তনে
বজ্রের গর্জনসাথে, যথা নির্ধারিত।
দেবগণ বলদৃপ্ত এ প্রোজ্জ্বল দৃশ্যেতে
যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে,
সৃষ্টির অচিন্ত্য কীর্তি এ বিপুল বিশ্বেতে
তেমনই মহিমময় যেমন আদিতে।

উনি ইহা রচনা করেছেন শুধু আমাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে, অর্থাৎ আমাকে শেখাবার জন্যে :

১। কি করে বাঙলায় সাবলীল ছন্দ লেখার সম্ভাবনায় আমার আস্থা বৃদ্ধি করে, আমি গ্যোতের আরো নিকটে আসি।

২। "ফাউস্তে"র মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে ভাষায়, ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা যায়।" এ ওঁর ভাষা, চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত।

৩। "চেষ্টা করিলে খাঁটি বাঙলা ভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অধিকাংশে অবিকৃত রাখা যায়।" ইহাও ওঁর ভাষা, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। সম্ভবত এইটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে উক্ত অনুবাদ-কবিতা লিখেছেন।

এখন দেখা যাক্ এইসব মহৎ সঙ্কল্প কতদূর কার্যে পরিণত হয়েছে!

(ক) প্রথমেই দেখা যাক্ ওঁর আক্ষরিক অনুবাদ কেমন হয়েছে? এই আট ছত্রের কবিতায় ১৬টি এমন সব বাঙলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার জার্মান প্রতিশব্দ মূলে নেই, যথা :

(১) দেব (২) সনাতন (৩) সংক্রমণে (৪) প্রতিদ্বন্দ্বী (৫) তারাদলে (৬) সদর্প (৭) চিরাভ্যস্ত (৮) আবর্তনে (৯) গর্জন (১০) দেবগণ (১১) প্রোজ্জ্বল (১২) দৃপ্ত (১৩) দ্যোতনা (১৪) কীর্তি (১৫) বিপুল (১৬) বিশ্বেতে।

অর্থাৎ প্রতি ছত্রে গড়ে দুটি করে "বলদীপ্ত" বাঙলা শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে যার জার্মান প্রতিশব্দ মূলে নেই। এই হলো আক্ষরিক অনুবাদের নমুনা?

(খ) এখন এর ছন্দের স্বরূপ আলোচনা করা যাক্। উনি যার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন, সেই "মিলগ্রন্থন" গ্যোতের ছন্দের মতন হয়েছে, নিঃসন্দেহে। বস্, এইখানেই গ্যোতের ছন্দের সঙ্গে মিলও শেষ হলো!

গ্যোতের এই অনবদ্য কবিতার ছন্দ হচ্ছে জার্মান 'ফিয়েরটাক্‌টের।' অর্থাৎ যার প্রতি ছত্রে চারটি প্রস্তরিত দল [syllables] ও চারটি অপ্রস্তরিত দল থাকে। কিন্তু গ্যোতে এর প্রথম ছত্রে চারটি প্রস্তরিত দল ও পাচটি অপ্রস্তরিত দল দিয়ে ও পরের ছত্রে চারটি প্রস্তরিত ও চারটি অপ্রস্তরিত দল দিয়ে, আর এরই লয় সৃষ্টি করে, এই ছন্দে এক অপূর্ব হিল্লোল এনেছেন, যা পাঠকের হৃদয়মনেও দোলা দেয়। কই, নীরেনবাবুর গ্যোতের অনুকরণে লেখা এই ছন্দে এই অপূর্ব দোলার তো কোনো চিহ্নও নেই! বা এতে গ্যোতের ছন্দই বা কোথায়? এই কি সদর্পে ঘোষিত, "চেষ্টা করিলে খাঁটি বাঙ্গলাভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অধিকাংশে অবিকৃত রাখা যায়" এই উক্তির নমুনা?

আর উনি কি বাংলা ছন্দ লিখেছেন না অন্য কিছু? তাহলে এটা কী ছন্দ হলো? গদ্যপদ্য, মুক্তক বা অমিত্রাক্ষর নয়, তাতো বুঝলাম। কিন্তু এ কি পয়ার? দীর্ঘপয়ার? মাত্রাবৃত্ত না লৌকিক? এরও কোনোটাই নয়। অর্থাৎ এ হলো না গ্যোতের ছন্দ না কোনো প্রচলিত বাংলা ছন্দ!

(গ) এখন দেখা যাক ওঁর অনুবাদটা কেমন হলো?

মূলের সঙ্গে তুলনা করলে এই আট ছত্রের অনুবাদে এগারটি ভুল হয়েছে, তার মধ্যে দুটি মারাত্মক ভুল। যথা :

(১) "সূর্যদেব" লেখা ভুল। গ্যোতে "সূর্য"কে দেবত্ব দেন নি, ওঁরও তা দেবার অধিকার নেই।

(২) "সনাতন সংক্রমণে" লেখা ভুল। মূলে আছে "পূর্বেরই মতন।" এই শব্দ দুটি উনি কোথা হতে আমদানি করলেন?

(৩) "সদর্প" শব্দ ব্যবহার করা ভুল। এর কোনো ভাব মূলে কোথাও নেই।

(৪) "সমাপিয়া"—ভুল। মূলে আছে "সমাপ্ত করছে," যা পদ্যে হবে "সমাপিছে।"

(৫) "চিরাভ্যস্ত"—এ শব্দের ব্যবহার ভুল। এর কোনো ভাব মূলে নেই।

(৬) "আবর্তনে"—এ শব্দের ব্যবহার ভুল। এর কোনো ভাব মূলে নেই। মূলে আছে "পূর্ববিহিত বিশ্বভ্রমণ"। উনি "চিরাভ্যস্ত আবর্তনে" এই শব্দ দুটি কোথা হতে আমদানি করলেন ?

(৭) "বজ্রের গর্জন সাথে"—ইহা মারাত্মক ভুল। শেলী ঠিক অনুবাদ করেছেন, "with thunder speed"

(৮) "দেবগণ"—ভুল। শেলী ঠিক লিখেছেন—"Angels."

(৯) "যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে"—এ মারাত্মক ভুল। শেলী ঠিক অনুবাদ করেছেন, "Though none its meaning fathom may"। "দ্যোতনা" ও meaning এক কথা নয়। "দ্যোতনা"—এই কথা উনি কোথা হতে আমদানি করলেন ?

(১০) "কীর্তি" এই শব্দের ব্যবহার ভুল। এর ভাব মূলে কোথাও নেই।

(১১) "বিপুল বিশ্বেতে"—এই দুই শব্দের ব্যবহার ভুল। মূলে এর ভাব নেই।

দাঁড়ালো এই মূলের সঙ্গে তুলনা করে এই আট ছত্রের অনুবাদ কবিতায় এগারটি অনুবাদের ভুল, যার মধ্যে দুটি মারাত্মক ভুল, যা মূলের ভাবই বিকৃত করে। এই হলো অবিকল অনুবাদের নমুনা, যার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি গ্যোতের আরো নিকটে আসব ?

(ঘ) এখন দেখা যাক ওঁর ছন্দ কেমন সাবলীল হয়েছে ?

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি গ্যোতের এই অপূর্ব কবিতার শান্তভাবের কথা। ইহাই অনুভব করে কবিবর শেলী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। "প্যানসফি"-দর্শনে বিরাট বিশ্বের যে সুসংগতির কল্পনা আছে তাহাই এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে শুধু কয়েকটি সহজ সরল জার্মান শব্দে। কঠিন শব্দের জন্য প্রসিদ্ধ জার্মান ভাষার একটি কঠিন শব্দও ব্যবহার করেন নি বলেই গ্যোতে এই অপূর্ব শান্তভাব এমন প্রসাদগুণ বিশিষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন। এ যেন উপনিষদে ব্রহ্মবর্ণনা ! শেলী এই ভাব তাঁর অপূর্ব অনুবাদে ফোটাতে পেরেছেন, তাই তা পড়ে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু নীরেনবাবুর ঘনসন্নিবেশিত "বলদৃপ্ত" যুক্তাক্ষরগুলি, বিশেষ করে প্রক্ষিপ্ত শব্দ ও ভুল অনুবাদের যুক্তাক্ষরগুলি, "বজ্রের গর্জনসাথে" এই অপূর্ব শান্তভাবের রসটাই নষ্ট করে দিয়েছে। উনি হয়তো মনে করেন ঘন ঘন যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ ব্যবহার করলেই ভাব ও রস যাই হোক, ছন্দ সাবলীল হয়। অধিক টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

কানাইলাল গাঙ্গুলী

/

পুস্তক পরিচয়

History of the Communist Party of the Soviet Union (মস্কো, ১৯৬০)

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এক নূতন যুগের সূচনা করেছে, বর্তমানে তা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কিছু কূপমণ্ডুক বা জ্ঞান-পাপী থাকা সম্ভব, কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা কিংবা নীরবতার ষড়যন্ত্র সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যাহত সাফল্যের মুখে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। সোভিয়েত বিপ্লব ক্রমশ দুনিয়ার বৃহত্তম জনসমষ্টিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে কৌতূহল জাগা তাই স্বাভাবিক। শুধু কৌতূহল নয়, প্রশ্নও জেগেছে। বিংশ পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী অনেক ঘটনা অনেকের পুরনো ধারণার মূলে আঘাত করেছে। নিছক ভাবাবেগে যাঁরা অভিভূত, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তবে মনে হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নূতন ইতিহাসে অনেক নূতন তথ্য আছে যা ইঙ্গিতপূর্ণ এবং অশেষ মূল্যবান। কোনো হালকা মন্তব্য করার আগে মনে রাখলে ভাল হয়, এই পার্টি রাশিয়ার জনসাধারণকে তিনটি বিপ্লবে পরিচালিত করেছে ; সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্তালিনগ্রাদের বিজয়ী লালফৌজের ধাত্রী এই পার্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ ধ্বংসলীলার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পার্টির নেতৃত্বে কৃষি ও শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এই পার্টির নৈতিক শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

নূতন ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই পুরনো ইতিহাস (১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত) মনে পড়ে—আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উপর এ বইটির প্রভাব সুবিদিত। দুটি বইয়ের গঠনসজ্জা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি প্রায় এক রকম। দুটি বইতেই লেনিনের বিভিন্ন বই এবং বক্তৃতার সারাংশ উপস্থিত। দুটি বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ দিয়ে। পুরনো বইতে স্তালিনের লেখা এবং বক্তৃতার উদ্ধৃতি প্রাধান্য, বইটি শেষ করা হয়েছে স্তালিনের বক্তৃতার একটি অংশ দিয়ে। নূতন

বইতে স্তালিনের লেখা এবং বক্তৃতার উল্লেখ আছে, তবে উদ্ধৃতি সীমিত। ক্রুশ্চেভের লেখা এবং বক্তৃতার উদ্ধৃতি স্বল্প। লেনিনের নামের পাশে সর্বত্রই স্তালিনের নাম নূতন বইতে সাড়ম্বরে উল্লিখিত হয় নি। লেনিনের নামের পাশে ক্রুশ্চেভের নামোল্লেখ চোখে পড়ে না। পার্টির পুরনো নেতাদের সম্পর্কে এবং স্তালিনের অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কিছু নূতন তথ্য নূতন বইতে আছে, যার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে, পার্টির পত্রিকা প্রকাশ এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের কথা নূতন বইতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এঁদের ভূমিকা ভুলে গেলে, কিংবা খাটো করে দেখলে, কিংবা দু একজন বড়ো নেতার অবদান বড়ো করে দেখলে, পার্টির সামূহিক নেতৃত্বের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। নূতন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ কাগজ "ইসক্রা" গড়ে তুলতে যে পেশাদার বিপ্লবীরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবুসকিন, কালিনিন, লিতভিনভ, ক্রুপসকায়া, পেত্রোভস্কি, সৌমিয়ান, স্তালিন, সার্দলভ প্রভৃতি, (পৃঃ ৬৫)। ১৯০৫ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে যে প্রতিনিধিরা লেনিনের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বোগদানভ, ক্রুপসকায়া, লিতভিনভ, লুনাচার্সকি প্রভৃতি (পৃঃ ৯৩)। প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রতিভাবান কূটনীতিবিদ লিতভিনভের নাম ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত হলেও পুরনো ইতিহাসে তাঁর নাম চোখে পড়ে না। ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরে জারতন্ত্রের হিংস্র দমননীতির কঠিন বৎসরগুলিতে যাঁরা মস্কো, পিটার্সবুর্গ, বাকু এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে পার্টির সংগঠন শক্তিশালী করবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুব্রোভিনস্কি, কালিনিন, কুইবিসেভ, সার্দলভ, জাপারিদজে, অর্জোনিকিদজে, সৌমিয়ান, স্পান্দারিয়ান, স্তালিন (পৃ ১৫৮-৫৯)। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাগ্ সম্মেলনে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, স্তালিনকে তার মধ্যে "কো-অপ্ট" করা হয়; নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, গোলোশচোকিন, অর্জোনিকিদজে, স্পান্দারিয়ান (পৃঃ ১৬৮)। ১৯১২ সালে প্রকাশিত "প্রাভদা" পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে এবং নিয়মিত লেখক হিসাবে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাতুরিন, ক্রুপসকায়া, মলোতভ, সার্দলভ, স্তালিন, গর্কি (পৃঃ ১৭০-৭১)। নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় কমিটির

ঐতিহাসিক অধিবেশনে যে "বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র" গঠিত হয়, তাঁর সভ্য ছিলেন বুবনভ, জারঝিনস্কি, স্তালিন, সার্দলভ এবং উরিতস্কি। লেনিন স্বয়ং ছিলেন এই কেন্দ্রের কর্ণধার (পৃঃ ২৫৩)। পুরনো বইতে যে তথ্য আছে তা এই রকম: বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র স্তালিনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। কি কারণে জানি না কেন্দ্রের অন্যান্য সভ্যদের নাম উল্লিখিত হয় নি (পৃঃ ৩১৮, পুরনো ইতিহাস)। ১৯১৮-২০ সালে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক অভিযান এবং দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের বিদ্রোহের মুখে যখন বিপ্লব বিপন্ন, কমিউনিস্ট পার্টি তখন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বিপ্লবকে রক্ষা করে। শ্রমিক-কৃষকদের মধ্য থেকে একদল নূতন "যুদ্ধ বীর" পুরোভাগ আসেন—প্লুচার, ভরোশিলভ, বুদেনি, চাপায়েভ ইত্যাদি (পৃঃ ৩০৩)। জারিৎসিন রক্ষার অমর যুদ্ধে লালফৌজকে পরিচালিত করেন ভরোশিলভ এবং স্তালিন (পৃঃ ৩০৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জারিৎসিন যুদ্ধজয়ের মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবীরা লেনিনকে গুলিবিদ্ধ করে এবং উরিতস্কিকে হত্যা করে (পৃঃ ৩০৪-৫)। আজারবাইজানে সোভিয়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে অর্জোনিকিদজে, কিরভ, মিকোয়ান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন (পৃঃ ৩২৭)। এই ঐতিহাসিক পর্বে যে নেতৃবৃন্দ পুরোভাগে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আন্দ্রিয়েভ, ক্রুশ্চেভ, মার্ণিক, ঝানভ, মিকোয়ান, ভরোশিলভ, স্তালিন, অর্জোনিকিদজে, কালিনিন, সার্দলভ, কুইবিসেভ প্রভৃতি (পৃঃ ৩৩৮)। প্রদত্ত তালিকায় দুটি নাম নিখোঁজ: মলোতভ এবং কাগানভিচ। ষষ্ঠদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে পূর্বোক্ত নেতাদের কয়েকজন উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, যথা কুইবিসেভ (পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি), অর্জোনিকিদজে (ভারী শিল্পের কমিসার), মিকোয়ান (সরবরাহ বিভাগের কমিসার), ইত্যাদি (পৃঃ ৪৫৮)।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানে স্তালিনের ভূমিকা আদৌ স্বীকার করা হচ্ছে না বলে যে প্রচার চলছে, এই বই পড়ে তা পুরো সত্য বলে মনে হয় না। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে স্তালিনের ভূমিকার খুঁটিনাটি বিবরণ এই ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য স্তালিনের ভূমিকার নূতন মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে স্তালিন বাদে আরো যাঁরা সংগঠন-শক্তি, নিষ্ঠা, সাহস, দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের ভূমিকা গৌণ করে দেখবার অভ্যাস বোধ হয় পরিত্যাজ্য। নূতন ইতিহাসের তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, পুরনো ইতিহাসে স্তালিনের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, অন্যান্য নেতাদের (বিশেষ করে

ক্রুপসকায়া, লিতভিনভ, উরিতস্কি, অর্জোনিকিদজে) ভূমিকার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

নূতন ইতিহাসে স্তালিনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য আছে, যা পুরনো বইতে অনুপস্থিত। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের পতন এবং অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার সময় পার্টির সামনে এক নূতন পরিস্থিতি হাজির হয়। পার্টির বহু কমিটি এবং নেতা অস্থায়ী সরকারকে "জনগণের দ্বারা পরিচালিত" করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্তালিন স্বয়ং "শান্তি স্থাপনের জন্য অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবার" পক্ষপাতী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত সংশোধন করেন। এই প্রসঙ্গে স্তালিন নিজে যা লিখেছিলেন, বইতে তা উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ২১৭)। স্তালিন সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্বে লেখা লেনিনের চিঠি উল্লেখযোগ্য। লেনিন স্পষ্টই সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনকে অপসারণ করবার সুপারিশ করেছিলেন: "think over a way of removing Stalin from that post and appointing somebody else, differing in all other respects from comrade Stalin by one single advantage, namely, that of being more tolerant, more loyal, more polite and considerate to comrades, less capricious, etc." (পৃঃ ৩৮৭)। স্তালিন-চরিত্রের যে দোষগুলি লেনিনের চোখে ধরা পড়েছিল, তা সম্ভবত পার্টির কর্মীদের কাছে মারাত্মক মনে হয় নি, কেননা লেনিনের এই চিঠি প্রতিনিধিরা শোনবার পরে স্তালিনকেই সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত করেন। স্তালিন-চরিত্রের দোষগুলি ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পার্টি এবং জনগণের মধ্যে তাঁর অপরিসীম খ্যাতি তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে তিনি নিজেকে অভ্রান্ত মনে করতে থাকেন। তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। পার্টিতে গণতন্ত্র উপেক্ষিত হয়। ব্যক্তি-পূজা পার্টি এবং রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতিসাধন করে (পৃঃ ৬৭০-৭১)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তি-পূজা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ব্যক্তি-পূজা প্রচলিত হতে পেরেছিল এবং তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্যক্তি-পূজা নিন্দিত হয়, পূজিত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে। এমন কি বেরিয়া (যাকে "political adventurer and scoundrel" বলা হয়েছে) দণ্ড পান স্তালিনের মৃত্যুর পরে।

ব্যক্তি-পূজা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে: স্তালিনের মধ্যে "মারাত্মক দোষ" থাকা সত্ত্বেও তাঁরই নেতৃত্বে কি সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তর নূতন ইতিহাসে পাওয়া যাবে। স্তালিনের অবদান অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাঁর অবদান অতিরঞ্জিত করা ভুল। "ইতিহাস বীরের সৃষ্টি" তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনায় ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেন, জনগণের ভূমিকা তাঁদের কাছে উপেক্ষিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের চমকপ্রদ সাফল্যের উৎস সন্ধান করতে হয় সমগ্র পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ভূমিকার মধ্যে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিযুক্ত সেনাধ্যক্ষদের (বুদেনি, গোভোরভ, কোনেভ, ম্যালিনভস্কি, তিমোশেঙ্কো, সোকোলভস্কি, ভাতুতিন, ভোরোনভ, ভরোশিলভ, জুকভ প্রভৃতির) অসাধারণ দক্ষতার মধ্যে, দেশপ্রেম এবং সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অটুট বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ জনগণের বীরত্ব, ত্যাগ এবং মনোবলের মধ্যে (পৃঃ ৬০০-৬০২)। বীরের ভূমিকা বড়ো করে দেখবার অভ্যাস যাঁদের মজ্জাগত, তাঁদের কাছে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, তবে বস্তুবাদী ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনার বিচারের এই পদ্ধতি সম্ভবত অসঙ্গত মনে হবে না।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে ব্যক্তি-পূজা প্রথম প্রকাশ্যে নিন্দিত হলেও, উনবিংশ কংগ্রেস থেকেই তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৬-৪৮ সালের মধ্যে পার্টিতে গণতন্ত্র প্রসারিত করা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত বৈঠক, আঞ্চলিক এবং শহর পার্টি সংগঠনের নিয়মিত সম্মেলন, পার্টি কমিটিগুলির নিয়মিত বৈঠক, সমালোচনা, আত্মসমালোচনা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় দর্শন, জীববিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব এবং অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হয়। অসংখ্য বৈঠক, সম্মেলন এবং আদর্শগত আলোচনার পরিণতি উনবিংশ পার্টি কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই পার্টির নিয়মাবলীর পরিবর্তনের উপর রিপোর্ট পেশ করেন ক্রুশ্চেভ। এই কংগ্রেসেই পার্টি তার বর্তমান নাম (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি) গ্রহণ করে (পৃঃ ৬২৬-৬৩৪)।

উনবিংশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার চার বৎসর পরে ঐতিহাসিক বিংশ পার্টি কংগ্রেস আহূত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬)। ইতিমধ্যে স্তালিনের মৃত্যু ঘটেছে (৫ই মার্চ, ১৯৫৩) এবং বেরিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে শুধু ব্যক্তি-পূজাই নিন্দিত হয় না। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বিশেষ অবস্থায় শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হয়, যে তত্ত্বগুলির বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিংশ পার্টি কংগ্রেসের সময় পূর্ণ সভ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮ লক্ষ এবং প্রার্থী সভ্যের ৪২ লক্ষ (পৃঃ ৬৬৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধের সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ নূতন পূর্ণ পার্টি সভ্য এবং প্রায় ৫০ লক্ষ প্রার্থী সভ্য পার্টিতে যোগদান করেছিলেন (পৃঃ ৬০৩)।

১৯৫৭ সালের ৭ই নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের চল্লিশ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতির যে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ বিবরণ নূতন ইতিহাসে আছে তার মধ্যে পার্টির আত্ম-প্রত্যয় প্রতিফলিত। চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস থেকে পার্টির প্রধান শিক্ষা এই : "the path of Socialism is the only correct path for the whole of mankind." (পৃঃ ৬৮৫-৯৭)।

লেনিনের প্রায় সমস্ত লেখার সারাংশ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এই বইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং প্রগতিবাদী আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে।

সুনীল সেন

জুনাপুর স্টীল (উত্তরখণ্ড)—গুণময় মান্না। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। দাম নয় টাকা।

একদিকে প্রবীণদের শিল্পের নামে বাণিজ্য, অন্যদিকে তরুণতমদের বিকার-বিলাসে বাংলা কথাসাহিত্যে যখন চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তখন সৎ ঔপন্যাসিকের চারিত্র্যের অভ্রান্ত প্রমাণে গুণময় মান্নার জুনাপুর স্টীল-এর দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের আশ্বস্ত করে। পরিচয়ে ইতোপূর্বে সমালোচিত উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডটির মতো দ্বিতীয় খণ্ডেরও জীবননিষ্ঠ এবং সেই কারণেই পরিণত শিল্পকর্মের মাহাত্ম্য বাংলা উপন্যাসের মেরুদণ্ডহীনতায় সত্যি বিস্ময়জনক।

জুনাপুর স্টীল-এর পটভূমির বিপুল বিস্তার প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রোমান্টিক কেচ্ছাকাহিনীর বৈচিত্র্যসাধনের নিছক অলংকরণের মতো এই পটভূমি আসে নি ; বাণিজ্যিক স্বার্থজর্জরিত আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে শিল্পীর জিজ্ঞাসা এবং জীবনের মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় টানেই একটি বিরাট শিল্পাঞ্চল বিধৃত হয়েছে। সেই সমগ্রতার বিন্যাসেই একদিকে স্থার ধীরানন্দ

মুখার্জী, জুনাপুর স্টীল কোম্পানীর অন্যতম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জেনারাল ম্যানেজার টম্‌সন্ এবং মিসেস টম্‌সন্, লেবার অফিসার অমরেশ ব্যানার্জী এবং তার মেয়ে সুমিত্রা, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র অনাদি ব্যানার্জী, এস্, আর মিটার, জেনেরাল ম্যানেজারের পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়ে লিলি, মিসেস রয়, সিনিয়র ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রী, জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র সুপ্রকাশ রায়, অ্যাক্‌শন্ কমিটির প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসী নেতা মনোতোষ মুখার্জী এবং তার মেয়ে শংকরী, ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ মাধবন, সোস্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি সমীরমোহন সেন এবং তার স্ত্রী মীনাক্ষী প্রভৃতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র ; অন্যদিকে শিবলাল এবং তার বোন পুষ্প, ব্লাস্ট ফার্নেসের খালাসী অপি সাউ, তার স্ত্রী কাদু এবং মেয়ে মেনকা, তাদের প্রতিবেশী লছমীকান্ত মিশির এবং তার স্ত্রী সরসতিয়া, লেবার অফিসারের দালাল বনমালী পাল, লেদম্যান করালী বারুই, রামেশ্বর সাহু, শিউপ্রসাদ, সুখন, বোরথা সিং এবং তার স্ত্রী রুক্‌মিনি, রামবিলাস মিশির, পার্বতীচরণ, অভিরাম দাস, কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসরক্ষক আনন্দ এবং পার্টির সেক্রেটারি সেখ ইসমাইল, বরখাস্ত শ্রমিক গদাধর পাণ্ডে, শ্রমিকশ্রেণীর পাত্রপাত্রী—এই সমস্ত অজস্র চরিত্রের চিন্তা, বিশ্বাস আচরণে, ঘটনার সংঘাতে তাদের আবেগপ্রতিক্রিয়ায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেই যেমন সেই জনপদজীবনের জটিলতা প্রাণবন্ত হয়েছে, তেমনি সেই জটিলতায়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলোর ব্যক্তিস্বরূপ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

কোনও রকম সরলীকরণকে প্রশ্রয় দেন নি বলেই গুণময় মান্না বিদেশী ও দেশী মালিকের স্বার্থের সংঘর্ষের জর্জরিত জীবনের দ্বিধা সংশয় বিভ্রান্তি এবং বিশ্বাসের আবেগের বলিষ্ঠতায় শ্রমিকদের আত্মোপলব্ধির প্রয়াসকে গভীর মানবিক সত্যরূপেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, যাতে আঘাত-যন্ত্রণাদীর্ণ সাধারণ জীবনের অসাধারণ মহত্ত্বকে, তার গৌরবময় ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে অনুভব করে আমরা শুদ্ধ হই।

স্পষ্টতই লেখক টলস্টয়ের ওঅর অ্যাণ্ড পীস্-এর প্যাটার্নটিকে অনুসরণ করেছেন : এক একটি দৃশ্যের স্তর পরম্পরায়, ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বের অসংখ্য তরঙ্গের সমবায়ে জীবন-সমুদ্রের বিশাল রূপ রচনায় তিনি নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন। কোনও কোনও দৃশ্য, ঘটনা চরিত্র তো মনে দাগ কেটে যায় : যেমন অন্ধকার রাত্রিতে শিল্পশহর জুনাপুরের রূপ, শ্রমিকদের সাময়িক বিভ্রান্তি

এবং অনামান্য বিশ্বাসের প্রেরণা, এস-ডি-ওর বাংলোর দিকে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা এবং তাদের গুলি করে মারার দৃশ্য, ভোলা যায় না লছমীকান্ত, সুখন, আনন্দ, আত্মগোপনকারী শিবলালের আশ্রয়দাতা বোরথা সিং এবং তার স্ত্রী রুক্‌মিনিকে, তেমনি অবিস্মরণীয় রুক্ষ কর্কশ, আত্মমর্যাদাবোধ ও সততায় কঠিন অপি সাউ, তার স্ত্রী কাহু ও মেয়ে মেনকা, কাহুর পরিচর্যায় লছমীকান্তের স্ত্রী সরসতিয়ার সন্তান প্রসবের দৃশ্যের রূপকে রক্ত ও অশ্রুতে সিক্ত শ্রমিক জীবনের নতুন সম্ভাবনার উদ্ভাস।

শ্রমিক জীবনের দ্বিধা সংশয়, আত্মোপলব্ধির প্রয়াস কেন্দ্রীয় তাৎপর্যের সংলগ্নতা পায় শিবলালের চরিত্রে, তার আত্মসচেতনতার সমস্যায়। শিবলালই জুনাপুর স্টিল-এর জীবন নাট্যের সূত্রধর। শ্রমিকদের সংগ্রাম তার কাছে নিছক দাবিদাওয়ার ব্যাপার নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশেরই অপরিহার্য স্তর। এ সংগ্রামের শরিক হওয়ার অর্থ আত্মপরায়ণতার মালিন্য থেকে এক গভীর ঐক্যের শুদ্ধতায় চৈতন্যের ব্যাপ্তি, জীবনের পূর্ণতার উপলব্ধি। ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা গলে বিশুদ্ধ হওয়ার চিত্রকল্পে শিবলালের শুদ্ধতা সন্ধানের মোটামুটি একটি সামগ্রিক রূপ অবশ্যই ফুটেছে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতায় তা তীক্ষ্ণ হতে পারে নি বলেই আমাদের প্রত্যাশা ঠিক পূর্ণ হয় না। বনমালী পালের ভাইঝি লীলাকে (লেবার অফিসারের লালসায় আত্মসমর্পণ করেছে বলে যার নামে দুর্নাম রটানো হয়েছে) গ্রহণ শিবলালের শুদ্ধতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু সেটা দ্বন্দ্বের জটিলতায়, শিবলালের চেতনার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আসে না বলেই অনেকটা পরিমাণেই বিবর্ণ। আর শিবলাল তার জীবনের মৌল সত্য সন্ধানের আকুতিতে সুবিধাবাদী কুটিল ষড়যন্ত্রকারী মনোতোষ মুখার্জীর সঙ্গে যে ভাবে একাত্মতা অনুভব করেছে ("শেষকালে এমন হল, ধ্বনির অপরিহার্য প্রতিধ্বনির মতো একজন কথা বললেই আর একজনের হৃদয়ে তার সমর্থন মেলে, এবং একটা কথা ভাববার সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেখলে অন্যে ঠিক সেই কথাটাই বলেছে।" পৃঃ ৩৬৮), তা পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন, বিসদৃশ।

শিবলালের বিশ্বাস প্রত্যয়ের বিপরীত প্রান্তে পাই লেবার অফিসার অমরেশ ব্যানার্জীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং তার জীবনযাত্রায় অনিবার্য শূন্যতাবোধের আশ্চর্য উজ্জ্বল চিত্র। লীলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপনের সামান্য ত্রুটিটুকু ভুলে গিয়েই স্বীকার করতে হয় এই চরিত্রচিত্রণের অসামান্যতা তথা লেখকের জীবনের সমগ্রতাবোধ।

রোমান্টিক মুখরোচক কাহিনীর প্রলোভনে যাঁরা ভোলেন না, কিংবা সাহিত্য সমালোচনার নামে সুবিধাবাদী, পক্ষপাতদুষ্ট, কুরুচিগ্রস্ত মনোভাবের ধৃষ্টতায় বিভ্রান্ত হন না, সেই সমস্ত সৎ পাঠকদের কাছে মানবিক প্রত্যয়নিষ্ঠ লেখক গুণময় মান্নার জুনাপুর স্টীল শুধু পাঠযোগ্য নয়, একটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা হিসেবেই গৃহীত হবে।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

উপন্যাস ও অবক্ষয়

লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। শিরোনামা: আধুনিক উপন্যাসের চেহারা। এই আলোচনায় আধুনিক ইংরাজী উপন্যাস সম্পর্কে এমন কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আলোচনায় বলা হয়েছে যে ১৯৬১ সালের অক্টোবরের শুরু থেকে ১৯৬২ সালের নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত টাইম্‌স্ পত্রিকায় মোট ২৫৬টি উপন্যাস সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের কারও নাম ছাপা হয় নি কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন বয়সের। প্রতি সপ্তাহে তাঁদের হাতে এমন সমস্ত বই বাছাই করে দেওয়া হতো যেগুলো সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বাছাই করতে হতো এই কারণে যে সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকাটি ছিল দীর্ঘ। ১৯৬১ সালে ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ৪৪৮৫টি, ১৯৬২ সালের প্রথম ছ-মাসে ২২৯৯টি। টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে উপন্যাস সমালোচিত হতে পারে পাঁচটি কি ছ'টি। অতএব মাত্র ২৫৬টি উপন্যাস সমালোচিত হতে পেরেছে।

কিন্তু এই ২৫৬টি উপন্যাসের সমালোচনা থেকে কি কোনো সিদ্ধান্ত টানা চলে? টাইম্‌স্ পত্রিকায় সে-চেষ্টা করা হয় নি। তবে সিদ্ধান্ত না করা যাক, সবক'টি সমালোচনা একসঙ্গে পড়ার পরে আধুনিক উপন্যাসের চেহারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা নিশ্চয়ই করা সম্ভব। এই ধারণাটি কী?

দেখা যাচ্ছে, একটি বিষয়ে সকল সমালোচকই একমত। কোনো উপন্যাসই সেই শ্রেণীর নয় যাকে বলা চলে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত বা আলোড়ন-সৃষ্টিকারী। অথচ অল্প কিছুকাল আগেও এই শ্রেণীর উপন্যাস যে একেবারে প্রকাশিত হয় নি তা নয়। অবশ্যই কোনো কোনো উপন্যাসকে সমালোচক এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সাম্প্রতিক উপন্যাস-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো উপন্যাস সম্পর্কেই কোনো সমালোচক বলতে পারেন নি যে এই বিশেষ উপন্যাসটির জন্যেই পাঠকসাধারণ এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। আলোচ্য

সময়কালের মধ্যে এমন উপন্যাস একটিও প্রকাশিত হয় নি যেটি হাতে নিয়ে সমালোচক বলতে পারতেন যে উপন্যাসটি প্রত্যেকটি পত্রিকায় সমালোচিত হবার মর্যাদা দাবি করতে পারে। উপন্যাস সম্পর্কে এই উক্তি শুধু টাইম্‌স্‌-এর সমালোচকদের নয়, অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনা-স্তম্ভের দিকে তাকালেও মোটামুটি এই উক্তিকে মেনে নিতে হয়। সাহিত্য-জগতে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়।

সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী? গোড়াতেই বলতে হয়, চিরাচরিত ধরনের কোনো গল্প বা প্লট সাম্প্রতিক উপন্যাসে একেবারেই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে 'তারপরে তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগল'-ধরনের গল্প তো একেবারেই নয়। picaresque খুবই কম, যদিও একেবারে লোপ পায় নি। মজার গল্প প্রায় না-থাকার মতো। ছোটগল্পের বই যদিও প্রকাশিত হয়ে চলেছে কিন্তু খুব যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে তা নয়। চিরাচরিত ধরনে লেখা ছোটগল্প বা শেষ লাইনে চমকসৃষ্টিকারী ছোটগল্প বাজারে এখন আর কাটে না। যে-সব ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায় তাদের তাদের আবেদন খুবই অল্পসংখ্যক লোকের কাছে বা সেগুলো সবই ইমপ্রেশনিস্ট ধরনের লেখা।

সাম্প্রতিক উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ যৌনতা। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উপন্যাসিকরা বাঁধা সড়ক ছেড়ে অনেক সময়েই অলিগলিতে বিচরণ করে থাকেন। শুধু ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি এখন আর উপন্যাসে তেমন কাটছে না, আমদানি করতে হয়েছে উভয় প্রকারের সমকামিতা কিংবা যৌনবিকৃতি, বা যৌন-সন্ত্রাশ বা যৌন-অক্ষমতা। অর্থাৎ, খুন থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষরা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সে-জায়গায় আসর জুড়ে বসছেন এমন সব মানুষ যাঁরা নেশাগ্রস্ত, আত্মহত্যা-প্রবণ, অবৈধ প্রেমে বিশ্বাসী, আতঙ্ক বা বাতিকগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ (বামন, খোঁড়া, কানা ইত্যাদি), পানাসক্ত, স্নায়ুরোগী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে এমন সব মানুষকেও হাজির করা হচ্ছে যারা কোনো সামাজিক অন্যায়ের বলি। কোথাও কোথাও জাতি বা বর্ণবিদ্বেষকে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। ব্যাপারটা প্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ফ্যাশনের মতো। আর সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, উপন্যাসে এমনি ধরনের কথা কিছু থাকলে সমালোচকরা অনুকূল হয়ে ওঠেন।

সাম্প্রতিক কালে বিদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ব্যাপকভাবে অনূদিত হচ্ছে। তার একটি সুফল এই যে উপন্যাসের পাঠকরা এখন অতি অনায়াসেই সারা বিশ্বে বিচরণ করতে পারছেন এবং উপন্যাসের মাধ্যমে এখন বিশ্বের যে-কোনো সমস্যাকে উপস্থাপিত করা চলে।

তবুও শেষ কথাটা এই যে উপন্যাস আর এখন আগেকার মতো জনপ্রিয় নয়। বরং দেখা যাচ্ছে, অনুরক্ত পাঠকদের কাছেও এখন অনেক বেশি কদর জীবনী, ইতিহাস, শিল্প ও ভ্রমণ সম্পর্কিত গ্রন্থের। এই প্রবণতা নিতান্তই সাময়িক তা কিছুতেই বলা চলে না। এই বিশেষ আর্টফর্মটির সূত্রপাত হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তারপরে ভিকটোরীয় যুগ পার হয়ে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাস-সাহিত্য জয়প্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছিল। এবারে কি অবক্ষয়ের পালা?

অপরাজেয় শিল্পসত্তা

১৯১২ সাল। রেনোয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে চলেছিল। তাই দেখে রেনোয়ার বন্ধুরা স্থির করলেন যে রেনোয়ার চিকিৎসার জন্যে কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকবেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের খোঁজখবর করবার জন্যে তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করে সারা ইউরোপে খোঁজখবর করতে লাগলেন।

অনেক বিচার-বিবেচনার পরে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনার একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনা হল। ভদ্রলোককে দেখে পছন্দ হল রেনোয়ার। তার কারণ বোধহয় এই যে এই ভদ্রলোকের চিকিৎসাশাস্ত্রে যতোই পাণ্ডিত্য থাক, শিল্পজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না।

রোগীকে পরীক্ষা করার পরে ডাক্তার কথা দিলেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি রোগীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা-দুটোকে আবার সজীব করে তুলবেন। কথাটা শুনে রেনোয়া শুধু একটু হাসলেন। ডাক্তারের কথাকে তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন, তা হয়তো নয়। কিন্তু মনে মনে তাঁর কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর পক্ষে আর কোনো দিনই সুস্থ মানুষের মতো চলেফিরে বেড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও তিনি কথা দিলেন যে ডাক্তারের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। কারণ ব্যাপারটা তাঁর কাছেও স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। হায়, তিনি যদি সত্যিই শিল্পের প্রেরণা পাবার জন্যে

গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারতেন! তিনি যদি সত্যিই ক্যানভাসের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ক্যানভাসের ছবিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন!

ডাক্তার তার চিকিৎসা শুরু করলেন পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে। মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, রেনোয়ার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তাঁকে অনেক বেশি জীবন্ত দেখাচ্ছে।

তারপর একদিন সকালে এসে ডাক্তার ঘোষণা করলেন যে রেনোয়াকে হেঁটে বেড়াতে হবে। রেনোয়া তখন ছবি আঁকবেন বলে সবে ঈজেলের সামনে এসে বসেছেন। তাঁর কোলের ওপরে রয়েছে রঙদানী। ক্যানভাসের ওপরে চোখ রেখে তন্ময় হয়ে তিনি ভাবছিলেন। ডাক্তারের ঘোষণা শুনে তাঁকে হুইলচেয়ার সমেত ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন রেনোয়ার ঠিক মুখোমুখি।

তারপরে ডাক্তার হাত ধরে রেনোয়াকে চেয়ার থেকে তুলে ধরলেন। গত দু-বছরের মধ্যে এই প্রথম রেনোয়া নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিহ্বল চোখে তিনি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

একটু পরেই ডাক্তার রেনোয়ার হাত ছেড়ে দিলেন এবং রেনোয়াকে হাঁটবার নির্দেশ দিলেন। হাতদুটি সামনে বাড়িয়ে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক সামনেটিতে। রেনোয়া যদি পড়ে যান তা হলে তিনি ধরে ফেলবেন।

কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। রেনোয়া নিজেই ডাক্তারকে আরো পেছনে সরে যেতে বললেন। তারপরে সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে একটি একটি করে পা ফেলে ঈজেলটাকে একপাক ঘুরে এলেন।

রেনোয়ার স্ত্রী নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, আনন্দে যেন তাঁর বুকটা ফেটে যাবে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রেনোয়া অতি অদ্ভুত এক ঘোষণা করে বসলেন। তখনো তিনি হুইলচেয়ারে বসেন নি, তখনো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই অবস্থাতেই ডাক্তারের উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'বাস, আর নয়। এই শেষ। হাঁটবার চেষ্টা করতে গিয়েই যদি আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি শেষ হয়ে যায় তবে ছবি আঁকব কী নিয়ে!' একটু থেমে ঠোঁটের ওপরে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটিয়ে তুলে তিনি আবার বললেন, 'যদি আমাকে বলা হয় যে তুমি হাঁটতে চাও না ছবি আঁকতে চাও তাহলে আমি বলব, আমি ছবি আঁকতেই চাই।'

এই চূড়ান্ত ঘোষণা করে রেনোয়া আবার তাঁর হুইলচেয়ারটিতে বসলেন। তারপরে তিনি আরো সাত বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কোনো দিনও তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন নি।

রেনোয়ার জীবনের এই শেষ সাত বছরের অনেকগুলো ফটো আছে। এই ফটোগুলো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই সাক্ষ্য দেবেন, তারপর থেকে রেনোয়ার শরীর ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমেই তাঁর শরীরের নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে যাচ্ছিল। হাতের আঙ্‌ুলগুলো এমনভাবে বেঁকে গিয়েছিল যে আঙ্‌ুল দিয়ে তিনি আর কোনো কিছু ধরতে পারতেন না। অনেকে লিখেছেন যে এই শেষ জীবনে রেনোয়া যখন ছবি আঁকতেন তখন রঙের তুলি তাঁর হাতের সঙ্গে বাঁধা থাকত। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অসুখে ভুগতে ভুগতে রেনোয়ার শরীরের চামড়া এতই নরম হয়ে গিয়েছিল যে একটা কাঠের তুলি ধরতে হলেও সেই চামড়ায় ফোস্‌কা পড়ে যেত। রেনোয়া করতেন কি, হাতের তালুতে একটুকরো ন্যাকড়া নিতেন আর বাঁকানো আঙ্‌ুল দিয়ে তুলির হাতলটাকে চেপে ধরতেন। তাঁর শেষ জীবনের ছবি এইরকম অস্বাভাবিক উপায়ে চেপে ধরা তুলির সাহায্যে আঁকা। কিন্তু তবুও তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছবি এঁকে গিয়েছেন। তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি বা তাঁর চোখের দৃষ্টি একটুও ঝাপসা হয়ে যায় নি। শরীরের যন্ত্রণা যতোই অসহ্য হয়ে উঠেছে ততোই তিনি বেশি বেশি ছবি এঁকেছেন।

এই শেষ জীবনে রেনোয়ার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর ছিল রাত্রিযাপন। বিছানার চাদরের সঙ্গে সামান্য একটু ঘষা লাগলেই তাঁর গায়ের চামড়া উঠে ঘা হয়ে যেত। এজন্যে বিছানায় শোয়ানোর আগে তাঁর সারা গায়ে ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হত। সারারাত তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করতেন কিন্তু তবুও কোনোদিন আত্মহত্যার চিন্তা করেন নি।

সর্দি হলে তাঁর নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত কিন্তু অক্ষম হাত দিয়ে নাক মুছবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর হার্নিয়া-বেল্ট্ গায়ের চামড়ায় কেটে বসত —মুখ বুজে সহ্য করতেন তিনি। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পরে তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরত—মনে মনে অভিশম্পাত দেওয়া ছাড়া তাঁর কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু তারপরেও সকাল হতো। হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাগানে একপাক ঘুরিয়ে আনা হতো তাঁকে। আর তারপরেই তিনি একেবারে অন্য মানুষ। ঈজেলের সামনে এসে বসতেন তিনি। রঙের তুলি বাড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে থাকত তাঁর সামনে। এমনি ভাবেই তিনি আশ্চর্য সব ছবি এঁকে গিয়েছেন। এক অপরাজেয় শিল্পীসত্তার কাছে শরীরের যন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

অশোক বসু

চ ল চ্চি ত্র

দুটি বিদেশী ছবি : আইল্যাণ্ড" এবং হোয়ার দ্য হট্ উইণ্ড্ ব্লোজ্ ।

জাপানী চরিত্রে শিল্পসুষমার প্রতি সর্বাঙ্গীন আকর্ষণের কথা প্রায় প্রবাদবাক্যের রূপ ধারণ করেছে। দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, শিষ্টাচারে, চারুকলায় সর্বত্রই ঐ শিল্পপারিপাট্যের ছাপ প্রকট, দূরদেশ থেকেও আমরা তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে থাকি।

পারিপাট্য বা শোভনতার প্রতি অটুট সতর্কতা যে অতিব্যস্ততায় পরিণত হয়ে শিল্পকর্মের আন্তরিকতা নষ্ট করে না তা নয়। 'গেট অফ্ হেল'-এর মতো costume film-এর পক্ষে stylisation অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু ক্ষেত্রান্তরে তা কৃত্রিমতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। ঐ কৃত্রিমতা বা 'artiness' মস্কো উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রাপ্ত 'আইল্যাণ্ড' নামক জাপানী ছবিটির গুণ অনেক পরিমাণে নষ্ট করেছে।

ডকুমেন্টরী পদ্ধতি এবং কাহিনী চিত্ররীতির সংমিশ্রণের সার্থক প্রয়োগ আমরা কেনেতো শিন্দোর 'চিল্ড্রেন অফ্ হিরোশিমা' ছবিতে দেখেছি। এর পেছনে ফ্ল্যাহার্টির চিত্রভাষার অনুশীলন হয়তো অনেকটাই দায়ী—শিন্দোর 'আইল্যাণ্ড' ছবিতে ফ্ল্যাহার্টির 'ম্যান্ অফ্ আরান্'-এর প্রভাব আদৌ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এ ছবিটিতে একটি কৃষক দম্পতির আয়াসসাধিত জীবনযাত্রার সরলরৈখিক নাটকীয়তাবর্জিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু চিত্রভঙ্গিতে লোকদেখানো সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা বিষয়বস্তুর গৌরবকে অনেকাংশে লঘু করেছে। 'ম্যান্ অফ্ আরান'-এর বিরূপ প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে যে চরম সত্যতার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে তা 'আইল্যাণ্ড' ছবির মিঠে সুরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চলচ্চিত্রে 'কাব্যগুণে'র আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে মাত্রাতিরিক্ত ঔদার্যের পরিচয় দিই। ভালো ক্যামেরায় তোলা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অভিনন্দিত করি 'কাব্যগুণসম্পন্ন' বলে। 'ম্যান্ অফ্ আরান' বা 'পথের পাঁচালী'তে কাব্যগুণ আছে, কিন্তু তার জন্য ফ্ল্যাহার্টি বা সত্যজিৎ রায়কে কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয় নি—প্রকৃতি ও মানুষের

পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ঘাটনে সে-কাব্য আপনি উৎসারিত হয়েছে, তার জন্য অষ্টপ্রহর ক্যামেরার আতসকাঁচে চিনি মাখাতে হয় নি।

এ ছবিকে 'নির্বাক' করার মধ্যে অপপ্রযুক্ত stylisation-এর আরেকটি দিক প্রকট হয়েছে। শব্দহীন যুগের চলচ্চিত্রের ব্যাকরণই ছিল আলাদা, তার সম্পাদনপদ্ধতিও ছিল ভিন্ন, শব্দযুক্ত ছবিতে তাকে হুবহু প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—উপস্থিত চরিত্রগুলির মুখের কথা চাপা দিলেই কোনো ছবি 'পটেম্‌কিনে'র মর্যাদার অংশভাক্ হয় না। 'আইল্যাণ্ড' 'শব্দযুক্ত' অথচ নির্বাক ছবি। ডকুমেন্টরী পদ্ধতির ছবিতে সংলাপকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না বটে তাই বলে ছবিতে উপস্থাপিত চরিত্রগুলিকে বোবা বানানো হয় না, বরং তাদের কণ্ঠস্বরকে সহায়ক প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেনেতো শিন্দো এই ছবিতে নানা প্রাকৃতিক শব্দের সাহায্য নিয়েছেন, অথচ চরিত্রগুলিকে নির্বাক রেখেছেন, যদিও শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ আবেগ প্রকাশের জন্য তাকে সশব্দ কান্নার আশ্রয় নিতে হয়েছে (ছবিটির শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত)। গত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত জাপানী ছবি 'হ্যাপিনেস্ অফ্ আস্ এ্যালোন'-এও এই জাতীয় নিরর্থক বচনহীনতা লক্ষ্য করেছি। একে চলচ্চিত্র-ভাষায় কোনো অভিনবত্বের সংযোজন মনে না হয়ে বরং ব্যবসাগত প্রচারেরই অঙ্গ বিশেষ বলে মনে হয়।

আইল্যাণ্ড ছবিতে অন্তিম মুহূর্ত ছাড়া সর্বত্রই কেনেতো শিন্দো "বিনাটকীকরণে"র চেষ্টা করেছেন। জুল দাসিনের "হোয়্যার দ্য হট্ উইণ্ড্ ব্লোজ" এর ঠিক বিপরীত—এ ছবি প্রতিটি সিকোয়েন্সে নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় সমৃদ্ধ। দাসিন্ নোভেল-ভাগ-পূর্ব পঞ্চাশদশকীয় ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। কার্নের মতো তাঁর চিত্রনাট্যে কাহিনীসজ্জার কুশলতা পাওয়া যায়, ক্লুজোর মতো তিনিও জীবনের রুক্ষ কঠিন পরুষ দিকের প্রতি আকৃষ্ট। আর সে কারণেই সিসিলি কিংবা গ্রীসের (নেভার অন্ সানডে) রুক্ষ অঞ্চল এবং অমার্জিত অধিবাসীদের তাঁর ছবিতে দেখা যায়।

রজার ভালিয়াঁর গকুর পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত এ ছবিটির পটভূমিকা এ শতাব্দীর প্রথমপাদের সিসিলির এক সাগরতীরে ছোট শহর। এখানকার আধুনিক সভ্যতা বহির্ভূত জগতে—ভবঘুরে বেকার যুবক, প্রাচীন ভাস্কর্য সংগ্রাহক নগরশাসক, যৌনকামনা কাতর কুরূপা নারী, প্রাণচঞ্চল এক কন্যা, নগর শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এক অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত কারবারী, তার সুদর্শন যুবক পুত্র ও তার প্রণয়প্রার্থী বিচারকের বয়স্কা স্ত্রী, বহির্জগতের

প্রতিভূরূপী এক ইঞ্জিনিয়ার ও শিশুপুত্রসহ এক টুরিস্ট দম্পতি—বিচিত্র চরিত্র সমাবেশে দাসিন এক নাটকীয় সংঘাতময় জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায়। ফরাসীসুলভ সংযত humour and irony এ ছবিকে উপভোগ্য করেছে। মালিনা মারকুরী, ইভ্‌স্ মঁতাদ্, পিয়ের ব্রাস্যুর, মার্চেল্লো মাস্ত্রাইয়নি প্রমুখ ক্ষমতাশালী অভিনেতৃ-সম্মেলনের ফলে অভিনয় এ ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ ছবি ফরাসী চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও, হলিউডের পণ্যভোজী ভারতীয় দর্শকের কাছে এর মূল্য নগণ্য নয়।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি : অভিযান

বিদেশে যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের গুণগ্রাহী তাঁরাও তাঁর ছবির তথাকথিত 'শ্লথগতি' সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করেন। ক্রুফো অবশ্য সরাসরি তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের চিত্র-সমালোচকেরা "প্রাচ্যত্বে"র দোহাই দিয়ে নানা ভাবে তাঁদের অস্বস্তিকে ঢাকতে চেষ্টা করেন। সত্যজিৎ রায়ের পূর্ববর্তী ছবিগুলির গতি শিল্পগত বিচারে দূষণীয় কিনা সেটা এখানে বিচার্য নয়, কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'অভিযান'-এর প্রথমার্ধ অন্তত শ্লথগতির অভিযোগে অভিযুক্ত হবে না, একথা তর্কাতীত—মাঝখানে কিছু অংশ 'indoor-drama' জাতীয় স্থৈর্য লাভ করলেও ছবি শেষ হয়েছে আবার প্রচণ্ড জলদ তালে এবং চিত্রনাট্যের এই উপভোগ্য গতিময়তা সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছাড়া আর কোনো ছবিতে এমন করে লভ্য হয় নি। সম্পাদনার চাতুর্যে, কাহিনী বর্ণনার সৌষ্ঠবে 'অভিযান' সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র গতি-দক্ষতার যথাযথ পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে শুধুমাত্র ঐ দক্ষতা সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। তাঁর ছবি থেকে মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এমন কোনো অভিজ্ঞতা আমরা আশা করতে অভ্যস্ত হয়েছি যা আমাদের অনুভাবনাকে অনেকদিন পর্যন্ত অধিকার করে থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের বোধকে সমৃদ্ধ করবে। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি "কাঞ্চনজঙ্ঘা" আমাদের সেই অভিজ্ঞতার অংশভাক্ করেছিল—তারাশঙ্করের উপন্যাসাশ্রয়ী এই ঘটনাবহুল বিপুলকায় ছবিটি উপভোগ্য হলেও সে রকম কোনো অভিজ্ঞতায় মনকে সমৃদ্ধ করে না।

এ ছবিকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাধারণ সৎ মানুষের উত্তরণের প্রচেষ্টার রূপায়ণ বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে—নামকরণেও ঐ জাতীয় প্রতিশ্রুতি আছে। প্রতিকূলতা রচনায় সত্যজিৎ রায় স্বভাবসিদ্ধ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষের অসামান্য অভিনয় সে-ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে, বীরেশ্বর সেন এবং 'উকিলবাবু'র অভিনেতারও প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু অভিযানকারী চরিত্রটিকে তিনি কোন রঙে এঁকেছেন? তার সমস্যা দ্বিবিধ—সামাজিক স্তরভেদের নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের প্রচেষ্টা, এবং একই সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীর সঙ্গে সম্পর্কজনিত জটিলতা। সাধারণভাবে দুটি সমস্যাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে মৌল। সত্যজিৎ রায় কি কারণে জানি না দুটি সমস্যাকেই লঘুভাবে চিত্রিত করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গিতে humour প্রাধান্য পাওয়ায় নরসিং-এর ভদ্দরলোক হবার চেষ্টাটা প্রায় ভদ্রলোকদের হাসিতামাশার পর্যায়ে রয়ে গেছে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাজনিত নারীবিদ্বেষও অনেকটা ঐ 'মজা'র মেজাজ মেশানো মনে হয়। মেরী নিলীমার সঙ্গে বিষম-সামাজিক প্রেমের অসার্থক পরিণতির মুহূর্তটুকু গভীরভাবে চিত্রিত, কিন্তু তার 'impact' বর্ণনায় আবার লঘুসংলাপে হাস্যরসাশ্রিত হাল্‌কামেজাজ এসে গেছে। শেষ পর্যন্ত নরসিং-এর প্রেমের সমস্যাকে সত্যজিৎ রায় রোমান্টিক রঙে রঞ্জিত করেছেন। সেতারের ঝংকারে বাস্তবাতিক্রান্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে, খোলা দরজার ভেতর দিয়ে নরসিং-এর কল্পনায় প্রস্তুত এক নারীমূর্তি আলোক-উদ্ভাসিত পটভূমিকা থেকে ছবির মতো ভেসে তার ঘরে এসেছে। ঐ দেহোপোজিবিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে যে তিক্ততা ও গভীর বেদনা বাঞ্ছিত হতে পারত, সত্যজিৎ রায় তাকে মধুর করেছেন সংলাপের কৌতুকময়তায়, সংগীতে। মধুর রসের প্রতি কারো সহজাত বিরাগ থাকবার কথা নয়। "অপুর সংসার"-এ অপু-অপর্ণার দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্যচিত্রণ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, কিন্তু এ ছবির মূল মেজাজের (অবশ্য সর্বত্রই বাঞ্ছিত রুক্ষতাকে অনেক মোলায়েম করা হয়েছে) সঙ্গে ঐ মাধুর্যের সাজুয্য নেই। ওয়াহীদা রহমানের সুন্দর অভিনয় সত্ত্বেও তাই গোলাবীপর্ব প্রত্যয়হীন এবং অগভীর মনে হয়।

অনুরূপ কারণেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নরসিং আমাদের কায়িক শ্রমজীবীশ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য বলিষ্ঠ প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার দুঃখ বেদনা হতাশা অধঃপতন সব কিছুকেই দূর থেকে

লঘু ভাবে দেখা এবং দেখানো হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবির ট্যাক্সী ড্রাইভার বিমলের ক্রোধ ভালবাসা, যন্ত্রের প্রতি মানবিক মমত্ববোধ, এক কথায় তার মানসিক উগ্রতা, আন্তরিক নৈকট্যে পরম উষ্ণতায় বিশ্বাসযোগ্য এবং আমাদের মনেও অভিজ্ঞতার সঞ্চারী। কিন্তু নরসিং-এর জীবনযাত্রায় কাহিনীগত কৌতুহল ছাড়া আর কোনো ভাবগত সংযোগ আমাদের নেই।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য মহৎ শিল্পকর্মের সঙ্গে এই ঘটনাপ্রধান উপভোগ্য সুনির্মিত ছবিটির একাসন দান যেমন আদৌ সমর্থনীয় নয়, তেমনি এ-ছবিকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর পরমোৎসাহী সমালোচকেরা সত্যজিৎ রায়ের শিল্পনিষ্ঠায় সন্দেহ করে যে কটূকাটব্য করছেন, সেটাও নিন্দনীয়। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও, সাধারণ বাংলা ছবির মানদণ্ডে 'অভিযান' যে অনেক উচ্চ পর্যায়ের রচনা বলে প্রমাণিত হবে সেটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। শুধুমাত্র 'টাইপেজ' সৃষ্টিতেই 'অভিযান' বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয় এবং বিশেষভাবে সত্যজিৎ রায়ের স্বভাবজ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। চলচ্চিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এ ছবিতে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় আছে যা সচরাচর বাংলা ছবিতে মেলে না আজকাল। তাছাড়া একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিটি কর্মে সমান মহত্ত্ব আমরা প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু সে প্রার্থনা ক্ষেত্রে বিশেষে পূর্ণ না হলেই সেই শিল্পী সম্পর্কে অশিষ্ট ভাষণ বর্ষণ করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনাই 'রক্তকরবী', 'গোরা' বা 'বলাকা' পর্যায়ের নয়!

ধ্রুব গুপ্ত

পরিচয়-এর এই সংখ্যার ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে শ্রীমতী সুলেখা সান্যালের মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল। শ্রীমতী সুলেখা ছিলেন পরিচয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর লেখিকা এবং অনেকাংশে পরিচয়েরই আবিষ্কার। এই অকালমৃত্যুতে পরিচয় যতোখানি ক্ষতিগ্রস্ত হল তা পূরণ হবার নয়। আগামী সংখ্যায় তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিয়ে তাঁর উদ্দেশে আমরা যথাসাধ্য স্মৃতি-তর্পণ করব।

সম্পাদকীয়

দেশের সঙ্কটকালে সাহিত্য আকাদেমির পক্ষ থেকে ভারতীয় লেখকদের উদ্দেশ্যে আবেদন এসেছে—দেশরক্ষার জন্য তাঁরা তাঁদের লেখনী ধারণ করুন। বাঙলা দেশের লেখকেরা অনেক পূর্বেই চারটি স্বতন্ত্র বিবৃতির দ্বারা নিজেদের এরূপ সংকল্প ঘোষণা করেছেন। পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকাদির মারফৎ এই সংকল্প-জাত কিছু ফসলেরও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়াও লেখকেরা দল বেঁধে সভাসমিতিতে যোগদান করেছেন, নতুন সমিতি গঠন করেছেন, মিছিলে পা মিলিয়েছেন, এবং জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াসের সঙ্গে এইভাবে যুক্ত থাকছেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বাঙলা দেশের লেখকেরা অতীতেও দেশের প্রতিটি পরম ক্ষণেই আপনাদের দায়িত্বের ও সুস্থ চিন্তাভাবনার প্রমাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। স্বদেশীর যুগ থেকে মন্বন্তরের দিন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এইরূপই ঐতিহ্য। স্বাধীনতার সুযোগে শুধু কলাকৈবল্যবাদের নামে সেক্স্-সোফিস্টিকেশন বিলাস, আধ্যাত্মিকতার নামে তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড়ফুঁক, বৈদগ্ধ্যের নামে বদ্‌লের-মালার্মে-কপচানিতেই যদি তা এখনো আত্মতৃপ্ত থাকত, তা হলে বাঙালী সাহিত্যিকের নাম মুছে গেলেও মানুষের সভ্যতার কোনো ক্ষতি হতো না—দেশের ইতিহাসের দুর্ভার বরং কিছুটা লঘুই হতো। আজ সেই ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের কালে একালের সাহিত্যিক আপনার সুস্থ চেতনাতেই সেই স্বাদেশিকতা ও মানবতার পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবেন—আপন সৃষ্টিকর্মেও প্রতিষ্ঠিত হবেন, দেশবাসীকেও সত্যসঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত করবেন,—এই আমাদের আশা।

জাতীয় জোয়ারের সব থেকে বড় দান এই যে, ভাষাগত, রাজ্যগত, জাত-উপজাত-সম্পর্কিত আকণ্ঠ পরিমাণ পঙ্ক আজ নিশ্চিহ্ন—অন্তত কিছুকালের মতো জাতি আজ সত্যই ঐক্যবদ্ধ। প্রাণাবেগের যখন জোয়ার ডাকে তখন তার সঙ্গে অবশ্য ভেসে আসে অনভিপ্রেত নানা আবর্জনাও। স্রোতেরই নিয়মে তা ভেসেও যায়, তাই জীবনই হয় জয়ী। স্বদেশীর দিন হতে এই সত্যেরও প্রমাণ আমরা জাতীয় প্রাণোচ্ছ্বাসের পর্বে পর্বে পেয়েছি। আর, সে ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষাও পেয়েছি আবর্জনাকে আভরণ করে তোলায় বিপদ কত, প্রমত্ততাকে প্রেরণা করে তুললে কোন্

চোরাবালিতে নিমজ্জন অনিবার্য। সাহিত্য আকাদেমি যে মহাকবির বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁরই কাছ থেকে আমরা এই কর্তব্য-চিন্তায়ও লাভ করতে পারি আমাদের শিক্ষা, নিতে পারি আমাদের সঙ্কট-মুহূর্তের দীক্ষা।

সমকালীন বহুপ্রশ্নের বিচারেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের গুরুরূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করি না—আর তাতেই আত্মরতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজতর হয়েছে বলে মনে করি। কি স্বদেশী যুগে, কি মহাযুদ্ধের কালে, কি সভ্যতার সংকটজনক ফ্যাশিস্ত ঔদ্ধত্যের দিনে,—রবীন্দ্রনাথ মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্যের ও লেখক হিসাবে আমাদের দায়িত্বের এক পৌরুষমণ্ডিত বীর্যবান্ মানবতার ও সৃষ্টিচেতনার অধিকার আমাদের, বিশেষ করে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের, দান করে গিয়েছেন। তাতে ভাববিলাসের ক্ষেত্র সংকুচিত, প্রমত্ততার সুযোগ অনুপস্থিত। সত্যের সুস্থ উদার স্বীকৃতিতে এই রবীন্দ্ররিক্থ প্রাণবান, প্রদীপ্ত ও সৃষ্টিপ্রবুদ্ধ। আমরা যদি চাই যে এ যন্ত্রণা ও সংগ্রাম মহৎ কোনো জীবন-সম্পদে জয়ী হোক, সৃষ্টির শাশ্বত সত্যে সমুজ্জ্বল হোক, তা হলে সেই কবি-নির্দেশেই আমাদের দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রসারিত করতে হবে—কারণ পশ্চাদ নয় সম্মুখই আমাদের পথ,—এমন কি, বর্তমানের ক্ষেত্র থেকেও ভবিষ্যতের দিগন্তের দিকে রাখতে হবে দৃষ্টি,—যে ভবিষ্যৎ যেমন আমাদের এই দেশের, তেমনি সর্বমানবেরও।

প্রাণপ্রবাহই জয়ী হবে, উত্তেজনার আবর্জনা নয়। আজ যখন এশিয়ার জ্ঞান-দীপাবলীর আয়োজন সংশয়িত তখন ইরান-যাত্রী কবির ভাষণটুকু স্মরণীয়: "চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনি মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই আমি আজ এই কামনা ঘোষণা করি যে, আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশ মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক—তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধ সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।" আমাদের এই 'নূতন নিরাময় সমাজনীতি'—সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনের সংকল্প জয়ী হবেই।

সেই ভবিষ্যৎ থেকে সেই নিয়তি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না, ভারতবর্ষকেও না—যতোই চীন থেকে আসুক আক্রমণের ঝটিকা; সাময়িক ভাবে বিপন্ন হোক্ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, ভারতমনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ, তার মানব-

ভ্রাতৃত্বের সাধনা। বরং আজকের উদ্দীপ্ত ভাবাবেগ ও উৎক্ষিপ্ত রোষবহ্নি অপবিত্র সেই বৈদেশিক ঔদ্ধত্যের আবর্জনাকেই শুধু ভস্মীভূত করবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় চেতনায় কবি-কথিত সেই মিলনের পথকেও প্রশস্ত করবে—যে মিলনে আমাদের চিত্তের প্রকাশ—যে মিলনে শুধু প্রাচ্যদেশেরই প্রতিষ্ঠা নয়, সর্বমানবেরই সার্থকতা। যতোদূর বুঝি—বিশেষ করে এটি লেখকেরই কাজ, সৃষ্টি-সাধকেরই দায়িত্ব, সাহিত্য-শিল্পেরই অপরিহার্য দায়ভাগ।

কারণ, লেখক সাহিত্যরচনা করবেন শুধু তা নিয়েই নয় যা তাঁর চোখে অত্যন্ত করে পড়ে, তা নিয়েও যাতে মানুষের অত্যন্ত আশা—ইতিহাসের যা অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারি: "বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা-অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয় তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট।...সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎসৃষ্টি ক'রে চলেছে।"

রবীন্দ্র শতবার্ষিক-উৎসবপূর্তি বৎসরে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়তো থাকত না যদি না দেখতাম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িকতার ঝঞ্ঝা-তাড়না বিক্ষোভ-বিভ্রান্তিতে পরিণত না হচ্ছে। আমরা তা দুর্লক্ষণ বলেই মনে করি, কিন্তু তাকে খণ্ড ও ক্ষুদ্র বলেই জ্ঞান করি। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনটি ঘটনার উল্লেখ কেউ কেউ করেছেন: একটি ঘটেছে উত্তর কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে, যার ফলে 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছে। আরেকটি ঘটেছে যাদবপুরের একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে, যার ফলে মধ্যরাত্রির গোপন ষড়যন্ত্রে ভস্মীভূত হয়েছে জনকল্যাণব্রতী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বহু পরিশ্রমে ও মমতায় গড়ে তোলা একটি গ্রন্থাগার। আরেকটি ঘটেছে জলপাইগুড়িতে, যার ফলে একজন প্রাক্তন সেনাপতির প্রত্যক্ষ প্ররোচনা

ছাত্রদের দিয়ে নরহত্যা করাতে চেয়েছে। ঘটনা তিনটি বিচ্ছিন্ন। কোনো কোনো মহলে তা নিয়েও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উত্তেজনার একটি প্রবাহ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্র থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও উত্থিত হয়েছে। স্বদেশীর দিন থেকে অন্ধ উত্তেজনার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তাতে আমাদের সন্দেহ নেই—এটাই সত্যকার স্বাদেশিকতার ঐতিহ্যের বাহক, আর প্রত্যেকটি সৎ লেখকই জানেন—এরূপ উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তাঁর ঐতিহ্য, তাঁর দায়িত্ব—যেমন তা দায়িত্ব প্রত্যেক সৎ মানুষের।

ইওরোপের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জাতি-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিদ্বেষকে আশ্রয় করে যে মানববিদ্বেষী মতবাদ শেষ পর্যন্ত কুৎসিত সর্বনাশের দিকে ইওরোপকে চালিত করেছিল, তারও সূত্রপাত এরূপ দুঃসময়ের দুর্বুদ্ধিকে সম্বল করেই ঘটেছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা—রবীন্দ্রনাথের দেশের লেখকরা যেন আজ সহজে বিস্মৃত না হই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই মতবাদের বিরুদ্ধে ও এই মতবাদ-আশ্রয়ী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নির্মম ধিক্কার ঘোষণা করেছিলেন। অতএব সাহিত্য আকাদেমির ডাকে যথার্থ রূপে সাড়া দিয়ে নিকট বর্তমান ও দূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণাই আমরা পোষণ করব।





পরিচয়

পৌষ ১৩৬৯

য়